স্মার্ট প্যারেন্টিং:

আদর্শ সন্তান গঠনে ইসলামী নীতিমালা

লেখক

মাওলানা মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান

সহকারী অধ্যাপক, জামিয়া ইসলামিয়া কেরালা, ভারত

অনুবাদক

দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ

(১৪৪৬-৪৭ হি./২০২৫-২৬ ঈ.)

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ

জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলুম হাজী সাইজউদ্দীন

কুতুব আইল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

০১৩০৩০৯৪৯২০

স্মার্ট প্যারেন্টিং:
আদর্শ সন্তান গঠনে ইসলামী নীতিমালা

তত্ত্বাবধানে
মুফতি আবু নাসির
প্রিন্সিপাল, জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলুম হাজী সাইজউদ্দীন
মাওলানা লোকমান কাসেমী
ভাইস প্রিন্সিপাল, জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলুম হাজী সাইজউদ্দীন

লেখক
মাওলানা মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, জামিয়া ইসলামিয়া কেরালা, ভারত

অনুবাদক
দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ
(১৪৪৬-৪৭ হি./২০২৫-২৬ ঈ.)

সম্পাদক
মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান
প্রধান মুফতি, জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলুম হাজী সাইজউদ্দীন মাদরাসা

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা নাঈম আহমাদ
সহকারী দারুল একামা, জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলুম হাজী সাইজউদ্দীন মাদরাসা

ডিজাইন ও মুদ্রণ
অভিরেখা-০১৬৩২-৩১৫৯১৩

শুভেচ্ছা বিনিময়: ২৬০ টাকা মাত্র

তোহফা

শাশ্বত সত্য পথের
আমরণ যাত্রী মোরা
পথে আছে স্মৃতির চাদর
আলো-আঁধারে মোড়া।
মরু বালিয়াড়ির পদরেখা
যেন যায় না খোয়া
ভাবনা বিচিত্রার বর্ণিল পাখা
যেন থাকে এতে লেখা
সেই কামনায়
এই ক্ষুদ্র হাদিয়া...

উৎসর্গ

কূল-কিনারা হীন এই উম্মতের কাণ্ডারি, সায়্যিদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চরণে—যার নূরের ছটায় আমরা পেয়েছি ইমানের পথ, পেয়েছি অনন্ত জীবনের দিশা।

গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এই ইলমি বাগানের স্থপতি, আমাদের জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা **হাজী সাইজউদ্দীন রহ.**-কে। যার চোখের পানি, ইখলাস ও ত্যাগের বিনিময়ে দাঁড়িয়ে আছে এই দ্বীনি মিনার।

হৃদয়ের সবটুকু আবেগ নিংড়ে, অশ্রুসজল চোখে স্মরণ করছি আমাদের সেই সব পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরামকে, যারা ইলমের মশাল হাতে আমাদের পথ দেখিয়েছেন, আমাদের মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন; কিন্তু আজ মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন না ফেরার দেশে। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে যারা এখন অন্ধকার কবরের বাসিন্দা, মাটির বিছানায় শায়িত—

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় **হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল হুসাইন রহ.**, **শায়খ আব্দুস সাত্তার কাসেমী রহ.**, **মাওলানা ওহীদুজ্জামান ওবায়দী রহ.** এবং **হাফেজ আব্দুল হক রহ.**।

হে দয়াময়!

আপনার এই নেককার বান্দারা আজ আপনার মেহমান। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু আপনি তাদের রুহের মাগফিরাত, কবরের নূরের বাতি এবং সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। তাদের শূন্যতা আমাদের কাঁদায়। আপনি তাদের জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

আমীন।

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা

মহান আল্লাহর অসংখ্য ও অগণিত দয়া-অনুগ্রহে এই অধমের লেখা اولاد کی تربیت: کوتاہیاں اور رہنما اصول নামক কিতাবের বাংলা অনুবাদ এখন আপনাদের হাতে। কিছুদিন পূর্বে اولاد کی تربیت: کوتاہیاں اور رہنما اصول শিরোনামে প্যারেন্টিং বিষয়ক কিছু চিন্তাভাবনা ও পরামর্শ ছোট পুস্তক আকারে জমা করি। লেখার সময় ইলমী মহল ও জনসাধারণের মাঝে বইটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি আমার কল্পনাতীত ছিল। فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّة

কিছুদিন পূর্বে কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও তা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে বাংলাদেশের সুপরিচিত ইলমী দুর্গ 'জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলূম হাজী সাইজউদ্দীন, নারায়ণগঞ্জ'-এর পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি ইমেইল আসে। তখন বিষয়টি জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং আমার লেখা বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে দিই। বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ এখন আপনাদের হাতে। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি জামিয়ার দায়িত্বশীলগণের এবং বিশেষভাবে নবীন ওলামায়ে কেরাম ও উঁচু হিম্মতের অধিকারী দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রভাইদের এবং তাদের মুশফিক উসতায মুফতি মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান সাহেব ও মুফতি নাঈম আহমাদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের এই সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। পাশাপাশি

পাঠকদের জন্য বইটিকে উপকারী ও প্রকাশকদের জন্য পরকালের পাথেয় বানান। আমীন।

সর্বযুগে বাংলাদেশ ইলম-আমল, দ্বীন ও রুহানিয়াতের গভীর সম্পর্কের কারণে পৃথিবী জুড়ে প্রসিদ্ধ। এই দেশের জনসাধারণের মাঝে সর্বদা ইসলামের আলো জ্বালিয়ে রাখতে বাংলার হক্কানী ওলামা-মাশায়েখদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমি আশাবাদী বইটির বাংলা অনুবাদ এই বরকতময় প্রচেষ্টার একটি মাধ্যম হবে। ইনশাআল্লাহ।

বইটি রচনার প্রেক্ষাপট

এমন সংকটময় মূহুর্তে আমি বইটি লিখেছি, যখন গভীরভাবে আমার এ বিষয়টি অনুভব হয় যে, বর্তমান সময়ের সিংহভাগ অভিভাবক তথা মা-বাবা সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে চরম অবহেলা ও বিভিন্ন সমস্যার শিকার হচ্ছেন। একদিকে বস্তুবাদের সয়লাব, অপরদিকে পশ্চিমা অপসংস্কৃতির প্রচার এবং তৃতীয়ত খোদ মুসলিম সমাজ নিজস্ব ইসলামিক কালচার ও সমাজব্যবস্থা থেকে বহুদূরে সরে যাওয়া।

এসব বাধা-বিপত্তি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এমন এক বিভ্রান্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তারা আত্মপরিচয় ও জাতীয় পরিচয়কে ভুলে যাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা এমন এক নাজুক সময় অতিক্রম করছি, যখন নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা ঘূর্ণিঝড়ের মত মুসলিম জনপদের দরজায় কড়া নাড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট ও আধুনিক টেকনোলজি একদিকে আমাদের জীবনব্যবস্থাকে সহজ করেছে বটে; অপরদিকে এগুলোই আমাদের নবীন প্রজন্মের ঈমান ও চরিত্র বিনষ্ট করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। যার ফলে অভিভাবকের দায়িত্ব কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সালাফ ও আকাবিরের অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ইতিবাচক নীতিমালা সামনে রেখে—সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা সাধারণত যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয় সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করা এবং তার বাস্তবসম্মত সমাধানও উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

বাঙালি পাঠকদের কাছে কিছু নিবেদন—

সন্তান হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশাল এক নেয়ামত। আমাদের কাছে তাঁর বিশেষ আমানত। কেয়ামতের দিন এই নেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাদেরকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা, ভালো জামা-কাপড়ের কিনে দেওয়া এবং তাদের জন্য উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটিই যথেষ্ট নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, সন্তানের মন-মস্তিষ্কে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত করা। তাদের স্বভাব-চরিত্র পরিমার্জিত করা। তাদেরকে একজন খাঁটি মুসলমান ও আদর্শ মানুষরূপে তৈরি করা।

বক্ষ্যমাণ বইটি সেসব অভিভাবকের জন্য একটি উত্তম পথপ্রদর্শক হবে যারা নিজেদের সন্তানকে একজন সৎ, দ্বীনদার ও সমাজের আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তুলতে চান।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশী পাঠকদের কাছে আমার আবেদন হল—

এক. শুধু একজন বইপ্রেমী হিসেবে নয়; বরং সন্তানের উত্তম আদর্শ প্রদানকে ইবাদত এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব মনে করে বইটির মাঝে থাকা নির্দেশনাবলীর উপর আমল করার নিয়তে পড়ুন।

দুই. অভিভাবকদেরকে প্রথমে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। কেননা, সন্তান হলো মা-বাবার প্রতিচ্ছবি। যেমন: যদি আপনি গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় না করেন তাহলে নিজ সন্তানের

ব্যাপারে এ আশা করবেন না যে, সে নামাজকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা চাইলে ভিন্ন হতে পারে।

তিন. নম্রতা ও মমতার সাথে তাদেরকে লালন-পালন করুন। প্রয়োজনে কঠোরতা করুন। তবে পরিমাপ অনুযায়ী।

চার. আল্লাহর নিকট দোয়া করতে কখনো অবহেলা করবেন না। মনে রাখবেন, আমাদের সকল চেষ্টার পাশাপাশি রব্বে কারীমের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে, পুনরায় আমি জামিয়ার অনুবাদক ছাত্রভাইদের ও বইটি প্রকাশনায় অংশীদার সকল সহযোগীদের শুকরিয়া আদায় করছি।

রবের দরবারে আমার আবেদন, তিনি যেন এই দ্বীনী খেদমতকে কবুল করে নেন। বইটির উপকারিতা ব্যাপক করে দেন। আমাদের সবাইকে নিজ নিজ সন্তানকে এমন শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার তাওফীক দান করেন। তারা যেন দুনিয়াতে তারা আমাদের চোখের শীতলতার কারণ হয়। আখেরাতে মুক্তির মাধ্যম হয়।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী সকল মানুষের জন্য উপকারী বানান। আগামী প্রজন্মের সংশোধনের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত সেবক ও ঝাণ্ডাবাহক বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান কাসেমী
সহকারী অধ্যাপক, জামিয়া ইসলামিয়া কেরালা
৭ জুমাদাল উলা, ১৪৪৭ হিজরী
৩০ অক্টোবর, ২০২৫ ঈসায়ী
raziqasmi@gmail.com

ফিদায়ে মিল্লাত সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ.-এর অন্যতম
সুযোগ্য খলিফা, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-এর স্বনামধন্য
ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদানী মজলিস বাংলাদেশ-এর সম্মানিত
সভাপতি,
হযরতুল আল্লাম শায়খ মুফতি হাফীজুদ্দীন দা.বা.-এর

দোয়া ও অভিমত

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

সন্তান প্রতিপালন ও চরিত্র গঠনের বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আমানতস্বরূপ। বর্তমান সময়ের জটিলতা, পারিবারিক বোঝাপড়ার অভাব ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে সন্তানকে কেবল সুশিক্ষিতই নয়; বরং দ্বীনদার, চরিত্রবান ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই নারায়ণগঞ্জের স্বনামধন্য দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলূম হাজী সাইজউদ্দীন (মাদরাসা)-এর ১৪৪৬-৪৭ হিজরী মোতাবেক ২০২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) সমাপনকারী তালিবুল-ইলমগণ *'স্মার্ট প্যারেন্টিং : আদর্শ সন্তান গঠনে ইসলামী নীতিমালা'* নামে ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বিশিষ্ট লেখক মাওলানা রাজিউর রহমান কাসেমী দা.বা.-এর সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

জামিয়ার প্রিন্সিপাল এবং আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মুফতি আবু নাসের সাহেব ও অন্যান্য দক্ষ ও মুশফিক আসাতিযায়ে কেরামের সার্বিক দিকনির্দেশনায় সদ্য ফারেগীন ছাত্ররা অত্যন্ত হিম্মতের সাথে এই কাজটি আঞ্জাম দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এ গ্রন্থে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে যাওয়া ভুল-ত্রুটি, মৌলিক নীতিমালা, যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা ও বাস্তবসম্মত পরামর্শ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। একজন অভিভাবকের জন্য এটি হবে আত্মসমালোচনার আয়না এবং আমলযোগ্য একটি পথনির্দেশক।

আমি দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা মূল গ্রন্থের সাথে সাথে এই অনুবাদকর্মটিও কবুল করুন। এর অনুবাদক ছাত্রবৃন্দ, সম্পাদকগণ এবং এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সকলকে আল্লাহ তাআলা ইস্তিকামাত দান করুন। সকলের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন এবং এর মাধ্যমে যেন বহু পরিবার উপকৃত হয় ও আদর্শ সন্তান গঠনের পথে অগ্রসর হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সন্তানদের হক আদায় এবং সঠিক তরবিয়ত প্রদানের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

শায়খ মুফতি হাফীজুদ্দীন দা.বা.
শাইখুল হাদীস,
জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলূম
হাজী সাইজউদ্দীন (মাদরাসা), নারায়ণগঞ্জ
২৪.০৬.১৪৪৭ হি. / ১৬.১২.২০২৫ খ্রি.

সম্পাদকের কথা

সন্তান আল্লাহ তাআলার এক অশেষ নেয়ামত। তারা আমাদের কলিজার টুকরো। পবিত্র এক আমানত। দুনিয়ার জীবনে সন্তান মা-বাবার চোখের শীতলতা। তেমনি পরকালেও তারা হতে পারে মা-বাবার নাজাতের উসিলা।

কিন্তু আজকের সময়টা বড় কঠিন। চারদিকে ফিতনার আগুন। নৈতিক অবক্ষয় আর অপসংস্কৃতির সয়লাব। এই ফেতনার ঝড়ের মধ্যে সন্তানকে কীভাবে বাঁচাব? কীভাবে তাকে দ্বীনদার হিসেবে গড়ে তুলব? এই চিন্তায় আজ প্রতিটি মা-বাবা দিশেহারা। 'প্যারেন্টিং' বা সন্তান প্রতিপালন এখন এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

এই কঠিন সময়ে বক্ষ্যমাণ বইটি হতে পারে আপনার জন্য আলোর মশাল। এটি মূলত উর্দু ভাষার একটি ছোট রিসালা। এ বইটিতে তাত্ত্বিক কথার চেয়ে বাস্তব দিকগুলোই বেশি উঠে এসেছে। এখানে সন্তান লালন-পালন নিয়ে দুইটি শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

এক—আমরা সচরাচর সন্তান লালন-পালনে কী কী ভুল করি? বইটিতে এমন ৩৮টি মারাত্মক ভুলের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে অভিভাবকরা সচেতন হতে পারেন।

দুই—আদর্শ সন্তান গড়তে আমাদের কী করণীয়? এরকম ৬৫টি টিপস এতে সহজ ভাষায় বাতলে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ, 'কী করবেন' আর 'কী ছাড়বেন'—তার এক চমৎকার সমাধান এই বইতে সংক্ষেপে পাবেন। এসব কিছুই পাবেন এই যুগের সমস্যার আলোকে।

আনন্দের কথা হলো, বইটির অনুবাদের কাজটি করেছে আমার অত্যন্ত প্রিয় একদল তালিবুল ইলম। তারা 'জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলূম হাজী সাইজউদ্দীন' এর চলতি শিক্ষাবর্ষের (১৪৪৬-৪৭ হি./২০২৫-২৬ ঈ.) দাওরায়ে হাদিস সমাপনকারী শিক্ষার্থী। হয়তো তাদের লেখার হাত এখনো পাকা হয়নি। এটি তাদের 'কাঁচা হাতের' ভালোবাসার ফসল। কিন্তু তাদের মেহনত ছিল খাঁটি। দ্বীনের প্রতি তাদের এই অনুরাগ সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। ইলমের পথে তাদের এই পদচারণা আমাদের স্বপ্ন দেখায়।

সাধারণত দেখা যায়, বিদায়ী ছাত্ররা বছর শেষে 'স্মারক' বা 'ডায়েরি' বের করে। তাতে চাকচিক্য থাকে, প্রচুর টাকাও খরচ হয়। কিন্তু দিনশেষে সেই ডায়েরিগুলো আলমারির তাকে বা সেলফে অবহেলায় পড়ে থাকে। ধুলো জমে। উম্মাহর খুব একটা কাজে আসে না। সব মাদরাসাতেই এখন কমবেশি এই রেওয়াজ চলছে।

গত সাত বছর ধরে আমি এই জামিয়ায় শিক্ষকতা করছি। প্রতি বছরই দাওরায়ে হাদিসের ছাত্রদের আমি একটি কথা বলে আসছি। আমি বারবার বলতাম— 'আপনারা গতানুগতিক ডায়েরি বের না করে উপকারী কোনো বই প্রকাশ করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে। বইটির হাজারো কপি লাখো মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। মুসলিম উম্মাহর মাকতাবায় নতুন একটি বই যুক্ত হবে।'

কিন্তু এতদিন কেউ সেই সাহস দেখাতে পারেনি। ৩ বছর আগের দাওরায়ে হাদিস সমাপনকারী শিক্ষার্থীরা একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। আমার

সেই স্বপ্নটা অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ! এবারের ছাত্ররা এক অনন্য নজির স্থাপন করল। তারা আমার সেই দীর্ঘদিনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তারা কাজ করে দেখিয়েছে। প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে হাঁটা সহজ ছিল না। কিন্তু তারা ডায়েরির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে উপকারী বই বের করার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নানান বাধা এসেছে। কিন্তু সব বাধা ডিঙিয়ে এই মাদরাসার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিদায়ী ছাত্রদের উদ্যোগে বের হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ বই।

এটি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমার বুকটা আজ গর্বে ভরে গেছে। আমি আশা করব, ভালো কাজের এই সুন্দর ও বরকতময় ধারাটি আগামীতেও চালু থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

ছাত্রদের সেই প্রাথমিক কাজটিকে গুছিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রিয় সহকর্মী মাওলানা নাঈম আহমাদ। তিনি জামিয়ার দারুল একামার সহকারী জিম্মাদার। অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি কাজটি করেছেন। কাঁচা লেখাগুলোকে ঘষামাজা করে একটি সুন্দর রূপ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটির বরকত আরও বেড়ে গেছে একটি বিশেষ কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মূল লেখকের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম। বাংলায় অনুবাদের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তিনি খুশির সাথে আমাদের অনুমতি দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, আমাদের আবদারও রক্ষা করেছেন। নিজ হাতে এই বইয়ের জন্য একটি বরকতময় ভূমিকা লিখে পাঠিয়েছেন। তার এই উদারতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। এটি আমাদের জন্য এক বড় পাওনা। আমরা বইয়ের শুরুতেই ভূমিকাটি অনুবাদ করে যুক্ত করে দিয়েছি।

সবশেষে বইটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার পালা। ভাষা যেন সহজ হয়, পড়তে যেন ভালো লাগে—সেদিকে আমি সাধ্যমতো নজর দিয়েছি। চেষ্টা করেছি প্রতিটি বাক্য যেন সাবলীল হয়। কথাগুলো যেন পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে স্পর্শ করে। চূড়ান্ত সম্পাদনার সময় আমি এই চেষ্টাই করেছি।

সত্যি বলতে কি, এই বইয়ের কাজ করতে গিয়ে আমি নিজেও চমকে গেছি। সন্তান মানুষ করার এমন অনেক সূক্ষ্ম বিষয় জেনেছি, যা আগে কখনো ভাবিনি। কিছু বিষয় এমন ছিলো যেগুলো প্যারেন্টিংয়ের হাই ভ্যালু পেইড কোর্স থেকে শিখেছি। অথচ সেগুলো খুব সাবলীল ভাষায় এখানে লেখা আছে। বইটির প্রতিটি ছত্র থেকে আমি উপকৃত হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারাও হতাশ হবেন না। বইটি পড়ে ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন। নিজেদের জীবনে এর সুফল দেখতে পাবেন।

পরিশেষে মহান রবের দরবারে হাত তুলছি। হে আল্লাহ! আপনি মূল লেখক ও অনুবাদক ছাত্রদের কবুল করুন। যারা এই কাজের সাথে জড়িত, সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এই গ্রন্থটিকে আমাদের নাজাতের উসিলা বানান। আমাদের সন্তানদের চোখের শীতলতা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত—

মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান
২৫ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৭ হি.
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ঈ.
মঙ্গলবার, রাত ১১:৫৯
দারুল ইফতা, হাজী সাইজউদ্দীন মাদরাসা
eliaskhan044@gmail.com

আমাদের কথা
(অনুবাদকবৃন্দের অভিব্যক্তি)

আলহামদুলিল্লাহ। ১৪৪৬-৪৭ হিজরী মোতাবেক ২০২৫-২৬ ঈ. শিক্ষাবর্ষ শুরু হল। নারায়ণগঞ্জের অন্যতম প্রাচীন দ্বীনী বিদ্যাপীঠ জামিয়া আরাবিয়া আনওয়ারুল উলূম হাজী সাইজউদ্দীন (মাদরাসা)-এ ইলমে হাদীস অর্জনের লক্ষ্যে তাকমীল (মাস্টার্স) জামাতে আমরা ভর্তি হই।

প্রতি বছর শিক্ষা সমাপনের স্মৃতি-স্মারক হিসেবে বিদায়ী ছাত্রদের পক্ষ থেকে ডায়েরি প্রকাশ করা হয়। তাই এবছরও আমরা ডায়েরি বানানোর নিয়ত করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে সকলেই পূর্ণ উৎসাহী ছিলাম। কোরবানির পরপরই ডায়েরির বিষয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হল, প্রথমে আমরা আসাতিযায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করবো। তারপর তাদের পরামর্শ অনুযায়ী অগ্রসর হব।

শুরু হলো পরামর্শের পালা। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ কয়েকজন উসতাযের সাথে পরামর্শকালে তারা জানালেন, ডায়েরি নয়; এমন

কিছু করো যা সবসময়ের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং সবাই এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করবে। যেমন- আরবী বা ভিন্ন কোনো ভাষার দ্বীনি বই অনুবাদ কিংবা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা যেতে পারে।

একটি বই অনুবাদ করার বিষয়টি আমাদের কাছে অনেক ভারী মনে হল। তাই আমরা সকলে স্মারক প্রকাশের ব্যাপারে মনস্থির করলাম, যাতে আসাতিযায়ে কেরাম এবং ছাত্রদের থেকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন লেখা থাকবে। কিন্তু এটিও কীভাবে শুরু করব, আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এভাবেই কেটে গেল কিছুদিন।

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা যখন খুব নিকটে, এমন সময় জামিয়ার ইফতা বিভাগের মুশরিফ, আমাদের মুহতারাম উসতায মুফতি মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান সাহেব আমাদেরকে বললেন, আপনারা ছোটখাটো কোনো বই অনুবাদ করে ফেলুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ, আপনারা পারবেন। পরপর মুফতি আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব ও মুফতি নাঈম আহমাদ সাহেবও আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরো উৎসাহিত করলেন। জামিয়ার সম্মানিত মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিমসহ অন্যান্য প্রবীণ উসতাযগণ সর্বদা আমাদেরকে সুপরামর্শ ও যেকোনো সমস্যা সমাধানে আমাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। অন্যান্য উসতাযগণ আমাদেরকে বাহবা জানান।

আমাদের প্রাণপ্রিয় উসতাযগণের এই সুধারণা আমাদের মাঝে প্রেরণা সঞ্চারিত করল। সকলের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হল, আমরা ছোট কোনো বইয়ের অনুবাদ করব। এরই প্রেক্ষিতে কয়েকটি বইয়ের খোঁজ করা হল। সবশেষে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে বিহারের জামিয়া ইসলামিয়া কেরালার সহকারী অধ্যাপক প্রখ্যাত গবেষক লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান কাসেমী রচিত 'اولاد کی تربیت کوتاہیاں اور رہنما اصول' কিতাবটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত হয়।

মুফতি মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান সাহেব ও মুফতি নাঈম আহমাদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে আমরা অনুবাদের কাজ শুরু করি। সামনে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বিরতি থাকায় এই বিরতিতেই অনুবাদের কাজটি সমাপ্ত করার দৃঢ় সংকল্প করি।

উসতাদগণ থেকে শিখেছি, সুবিন্যস্তভাবে কোনো কাজ করলে অনেক দ্রুত ও সুন্দরভাবে তা সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই আমরা অনুবাদের জন্য বইটিকে নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বিরতিতেই পুরো বইটির অনুবাদ সমাপ্ত হল।

বইটি যেহেতু উর্দু ভাষায় ছিল তাই আমাদের জন্য অনুবাদ করায় তেমন কষ্ট হয়নি। অবশ্য কঠিন শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন উর্দু অভিধান এবং কঠিন বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে উসতাযগণের শরণাপন্ন হয়েছি। আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের মত অযোগ্যদেরকে কাজটি সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেছেন।

আমরা সব দিক দিয়ে নবীন। অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার বিবেচনায় অনেক দুর্বল। তবু হিম্মত করেছি একটু কাজ করার। আমাদের অনুবাদ তো ছিল আমাদের কচি হাতের কাঁচা লেখায় পূর্ণ। কিন্তু আমাদের মুশফিক উসতায মুফতি মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান ও মুফতি নাঈম আহমাদ সাহেব আমাদের কাজকে নিজেদের কাজ মনে করে নিলেন। তারা সবসময় কাজের অবস্থা ও গতির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে কাজটিকে গতিশীল করার চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহর শোকর, আমরা তাদের কাছে যতটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। আল্লাহ পাক তাদেরকে নিজ শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

জামিয়ার স্বনামধন্য মুহতামিম মুফতি আবু নাসের ও নায়েবে মুহতামিম মাওলানা লোকমান কাসেমীসহ অন্যান্য উসতাযগণের দোয়া-পরামর্শ ছিল আমাদের জন্য পাওয়ার হাউজ। আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া ও বরকত আমাদের জন্য দীর্ঘ করে দিন।

আমাদের সেরেতাজ প্রিয় শায়েখ, মুফতি হাফীজুদ্দীন সাহেব বইটির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত লিখে আমাদের উপর অনেক বড় ইহসান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরসহ গোটা উম্মতকে হযরত থেকে আরো বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

তাকমীল জামাতের সকলেই কোনো না কোনোভাবে বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজে নিজেদের শ্রম ব্যয় করেছেন। অনুবাদের কাজে ছিলেন মাওলানা যোবায়ের বিন নাসির, মাওলানা হাসান হাবীব, মাওলানা শরিফুল ইসলাম, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা হাফিজুল ইসলাম, মাওলানা আমির হামজা, মাওলানা মাসুদ মোল্লা, মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম ও মাওলানা হুজাইফা আহমাদ।

অনুবাদের পর পূর্ণ বইটির প্রাথমিক প্রুফ দেখেছেন- মাওলানা যোবায়ের বিন নাসির, মাওলানা মাসউদ মোল্লা ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ। অন্যান্য কাজে শ্রম দিয়েছেন- মাওলানা জুবায়ের বিন নুরুল ইসলাম, মাওলানা বেলাল হোসাইন, মাওলানা ইকবাল হোসেন, মাওলানা আল-আমিন, মাওলানা ইসমাইল ও মাওলানা আব্দুর রহমান।

ধারাবাহিকভাবে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে পূর্ণ বইটির প্রথম ধাপের সম্পাদনা করেছেন মুফতি নাঈম আহমাদ সাহেব এবং চূড়ান্ত সম্পাদনা করেছেন মুফতি মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান সাহেব।

সকলের সর্বাত্মক সহায়তা আমাদের শামিলে হাল না হলে হয়তো এত বড় কাজটি সমাপ্ত করা আমাদের জন্য সম্ভব হতো না। তাই আল্লাহ তাআলার নিকট করজোরে নিবেদন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের সকলকে আপন শান অনুযায়ী জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন ও আপনার ভয় মিশ্রিত ভালোবাসা দিয়ে প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

শত চেষ্টার পরেও এই কাজে ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ আমরা তো মানুষ। তাই 'মানুষ' পাঠকদের কাছে আবেদন, কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা আপনার কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা বইটিকে আমাদের সকলের পরকালে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

নিবেদন
দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ
২৩ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৭ হি.
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ঈ.

উর্দু বইটির প্রকাশকের ভূমিকা

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের বড় একটি অংশ ফিতনা-ফাসাদ ও অশ্লীলতার শিকার। ফলে এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে সমাজব্যবস্থার সংস্কার করা।

এক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নোংরা ও অবাঞ্ছিত বিষয়াবলির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। এ বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, সমাজ-সংস্কার বিষয়ক ছোট-বড় বই-পত্র, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।

একটি সমাজ বিনষ্ট বা সুশীল হওয়ার ক্ষেত্রে যুবকদের ভূমিকা অনেক বেশি। কেননা সমাজে কাজের পরিবেশ তাদের দ্বারাই তৈরি হয়। তাই যুবকদের উত্তম আদর্শ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ উদ্দেশ্যেই নবীন আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান কাসেমী اولاد کی تربیت؛ کوتاہیاں اور رہنما اصول নামক রিসালাটি রচনা করেছেন।

বক্ষ্যমান গ্রন্থের সম্মানিত লেখক উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে মাস্টার্স সমাপন করেছেন। অতঃপর আলমা'হাদুল 'আলী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ থেকে ইফতা সমাপন করে অতিরিক্ত এক বছর মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তরবিয়ত বিষয়ক গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেরালার শান্তারামপুরে অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়ায় শরীয়া ও উসূলুদ-দ্বীন অনুষদের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন এবং দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিএ (শেষবর্ষ)-এ অধ্যয়নরত। কিছুদিন পূর্বেই তার রচিত ظلم وزیادتی کی وجہ سے فسخ نکاح কিতাবটি প্রকাশ হয়েছে।

এই অধমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদরাসায়ে হুসাইনিয়া তালীমুল ইসলাম, গিয়ারী, দারভাঙ্গা-এর পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল, উক্ত কিতাবটি প্রকাশনার দায়িত্ব এই জামিয়ার উপর অর্পিত হয়েছে। আর এই জামিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধান করা ও জনসাধারণের মাঝে সঠিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো। সামাজিক আচার-ব্যবস্থা সংশোধন করা। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন লেখক ও অত্র জামিয়ার পক্ষ থেকে বক্ষ্যমান বইটিও কবুল করে নেন এবং মানুষের জন্য উপকারী বানান।

পাঠকের নিকট আবেদন, তারা যেন এই জামিয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ জামিয়া সমাজের শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থার মাঝে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা যেন এ জামিয়ার সার্বিক উন্নতি সাধন করেন। সকল ধরনের অনিষ্ঠতা ও ফেতনা মুক্ত রাখেন। জামিয়ার সকল প্রয়োজন নিজ ভাণ্ডার থেকে ব্যবস্থা করে দেন। আমীন।

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

মাওলানা নুরুল ইসলাম মাযাহিরী
পরিচালক, মাদরাসায়ে হুসাইনিয়া তালীমুল ইসলাম
গিয়ারী, দারভাঙ্গা, বিহার, ভারত
০৭-০৫-১৪৩২ হিজরী
১১-০৪-২০১১ ঈসায়ী

উর্দু বইটির ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে তিনি মানবজাতিকে বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত দান করেছেন। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

অর্থ : আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। 1

নেয়ামত ইহকালীন হোক বা পরকালীন, ছোট হোক বা বড়, তা গণনা করে শেষ করা অসম্ভব। এই অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত হল সন্তান-সন্ততি। উম্মাহর মহান ব্যক্তিগণ তাহাজ্জুদ নামাযে গুরুত্বের সাথে যার কামনা করতেন এভাবে-

1 সূরা *লুকমান*: ২০

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ: যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা হবে চোখের শীতলতা, আর আমাদের বানান মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ। 2

নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এরও প্রার্থনা ছিল-

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে সৎ সন্তান দান করুন। 3

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দোয়া করতেন-

اللهم إني أسألك صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মানুষকে যে ধন-দৌলত, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দান করে থাকেন আমি আপনার কাছে তার উত্তমগুলো প্রার্থনা করছি, যারা পথভ্রষ্ট নয় এবং ভ্রষ্টকারীও নয়। 4

অতএব, সন্তানাদি রবের বিশেষ নেয়ামত। তাদের যথাযথ ও সঠিক লালন পালন করা জরুরি। জাহান্নামের শাস্তি থেকে তাদের বাঁচানোর সমূহ চেষ্টা করা অভিভাবক ও পরিবারের দায়িত্ব।

সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক অনেক বইপুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে নবীন ও যোগ্য আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান বিন সফিউর রহমান কাসেমী রচিত اولاد کی تربیت؛ کوتاہیاں اور رہنما اصول কিতাবটি এ বিষয়ে অনন্য। মাওলানা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সূক্ষ্মভাবে এ ব্যাপারে সংশোধনমূলক গভীর আলোচনা করেছেন। শিশুদের পার্থিব, আধ্যাত্মিক ও

---

2 *সূরা ফুরকান : ৭৪*

3 সূরা সফফাত : ১০০

4 সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ২৫০

শিখনমূলক প্রতিপালন সম্পর্কে বিজ্ঞজনের পরামর্শ সঙ্কলন করেছেন। সংক্ষিপ্ত কলেবরের কিতাবটি উলামা ও অভিভাবকদের জন্য একটি মূল্যবান উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে, ইনশাআল্লাহ। এতে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

বক্ষ্যমান গ্রন্থের বিজ্ঞ লেখক ইতঃপূর্বে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে চার ইমামের মতামত সম্বলিত একটি কিতাব রচনা করেছেন। সেটি উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে মুফতি ও কাযী (শরয়ী আদালতের বিচারক)-দের জন্য একটি মূল্যবান হাদিয়া ছিল। লেখকের পিতা তার নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান। তাই আল্লাহ তাআলার নিকটও আমার পক্ষ থেকে তার জন্য দোয়া রইল-

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

অর্থ: হে আমার রব! আপনি তাকে সন্তোষভাজন বানান। 5

আল্লাহ তাআলা তার ইলমের মাধ্যমে উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণ সাধন করুন এবং তাকে বড় বড় ইলমী খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম মুজাফফরপুরী
বিচারপতি, ইসলামী বিচার বিভাগ, বিহার, ভারত
০৬-০৫-২০১১ ঈসায়ী

5 এটি মূলত সূরা মারইয়ামের ৬ নং আয়াতের অংশবিশেষ।

বিহারের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, অনুদিত গ্রন্থের লেখকের সম্মানিত পিতা, মাওলানা মুহাম্মাদ সফিউর রহমান কাসেমী হাফি.-এর

দোয়া ও অভিমত

আমার প্রিয় পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান কাসেমী اولاد کی تربیت؛ کوتاہیاں اور رہنما اصول নামক কিতাবটি রচনা করেছেন। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের থেকে ছোট-বড় যে ভুলগুলো ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, মাওলানা সেগুলোর প্রতি সতর্ক করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ষাটের অধিক শিরোনামে পিতা-মাতার জন্য সঠিক প্রতিপালন নীতিমালা আলোচনা করেছেন। তাই সকল অভিভাবকদের বইটি অধ্যয়ন করা উচিত বলে মনে করি।

এ কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি যারপরনাই আনন্দিত। কিছুদিন পূর্বেই মাওলানা সাহেবের আইন বিষয়ক একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে।

রবের নিকট আবেদন, তিনি যেন আমার এ জ্যোতিকে নিজ হেফাজতে রাখেন। তাকে সুস্থতা দান করেন। বেশির চেয়ে বেশি দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করেন। তাকে কবুল করে নেন। আমার এবং তার মায়ের জন্য তাকে আখেরাতে মুক্তির উসিলা বানান।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

মাওলানা মুহাম্মাদ সফিউর রহমান কাসেমী হাফি.

সদরুল মুদাররিসীন
মাদরাসায়ে ইসলামিয়া শুকুরপুর, বারুয়ার,
দারভাঙ্গা, বিহার।
০৮-০৫-১৪৩২ হিজরী

বইয়ের পাতায় রইল লেখা
আমার মনের কথা

আপনার ওই হৃদয়ে হয়তো
রইবে এসব গাঁথা

সূচীপত্র

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা	৫
দোয়া ও অভিমত	৯
সম্পাদকের কথা	১১
আমাদের কথা	১৫
উর্দু বইটির প্রকাশকের ভূমিকা	২০
উর্দু বইটির ভূমিকা	২৩
দোয়া ও অভিমত	২৬

প্রথম অধ্যায়

প্যারেন্টিংয়ের ৩৮টি ভুল

শুরুর কথা	৩৩
প্রাককথন: সন্তান লালন-পালনে অবহেলা না করা	৩৮
ছোটখাটো বিষয় বাচ্চাদের ভয় দেখানো	৪৩
সন্তানকে বিদ্রোহী ও বাচাল করে তোলা	৪৪

অতি আরাম আয়েশে অভ্যস্ত করে তোলা	৪৫
সকল আবদার পূরণ করা	৪৬
কাঁদলেই সব কথা মেনে নেওয়া	৪৬
পরিণত বয়সের আগেই গাড়ি বা সাইকেল ইত্যাদি কিনে দেওয়া	৪৭
প্রয়োজন-অতিরিক্ত শাসন করা	৪৮
স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত রাখা	৪৮
সন্তানের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা	৪৯
অতিরিক্ত ভালো ধারণা পোষণ করা	৫০
সন্তানকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখা	৫১
সন্তানদের মাঝে বৈষম্য করা	৫২
প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বিবাহের ব্যবস্থা না করা	৫৩
উপার্জন ভোগ করতে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিবাহে বিলম্ব করা	৫৩
ছেলে-মেয়ের জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ তালাশ না করা	৫৪
সন্তানের অসুন্দর নাম রাখা	৫৪
মা-বাবা দীর্ঘ সময় ঘরের বাহিরে থাকা	৫৬
রাগ করে সন্তানের জন্য বদদোয়া করা	৫৬
মন্দ কথা ও কাজে অভ্যস্ত করে তোলা	৫৭
সন্তানের সামনে গুনাহ করা	৫৮
অশ্লীল ও মন্দ জিনিসপত্র ঘরে নিয়ে আসা	৫৯
সন্তানকে সাথে নিয়ে ঘুমানো	৫৯
মা-বাবার মাঝে খুব বেশি ঝগড়া হওয়া	৬০
বাবা-মায়ের কথা ও কাজে মিল না থাকা	৬১
ঘরের বুয়া বা কাজের লোক নির্বাচনে সতর্ক না হওয়া	৬২
মেয়েদেরকে গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে বাহিরে যেতে দেওয়া	৬২
মোবাইল ফোন ব্যবহারে যথাযথ সতর্ক অবলম্বন না করা	৬৩
সন্তান কোন ধরনের বই পড়ছে—এ ব্যাপারে অবহেলা করা	৬৪
সন্তানকে অপমান করা ও মনোবল দুর্বল করে দেওয়া	৬৪
সন্তানকে দায়িত্ববান বানানোর চেষ্টা না করা	৬৫

সন্তানের মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা না করা ৬৬
সন্তানের বয়সের প্রতি লক্ষ্য না রাখা ৬৭
সন্তান লালন-পালনে ব্যর্থ লোকদের গালমন্দ করা ৬৭
সন্তানকে দুনিয়াবি শিক্ষা না দেওয়া ৬৮
সন্তানকে দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞ রাখা ৬৯
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল বা মাদ্রাসা) নির্বাচন অবহেলা করা ৭০
বাড়ির কাছে সন্তানের সহায়তা না করা ৭১
সন্তানের উপস্থিতিতে শিক্ষকের বিরোধিতা করা ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের ৬৫টি টিপস

প্রাককথন : ইসলাম ও সন্তানের লালন পালন ৭৫
বিবাহের জন্য দ্বীনদার পাত্রী নির্বাচন করা ৭৬
নেক সন্তানের জন্য দোয়া করা ৭৭
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আনন্দ প্রকাশ করা ৭৮
উত্তম তরবিয়তের জন্য রবের কাছে সাহায্য চাওয়া ৮০
সন্তানদের জন্য দোয়া করা ৮০
সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ৮১
ঈমান ও আকিদাগত বিষয়াবলি সন্তানের বুকে ধারণ করানো ৮২
শিশুদেরকে নৈতিক গুণাবলীতে আলোকিত করা ৮৩
সন্তানদের খারাপ চরিত্র থেকে রক্ষা করা ৮৩
ইসলামী শিষ্টাচার শেখানো এবং অভ্যাসে পরিণত করা ৮৪
শিশুদের সাথে ভালো কথা বলা ৮৫
বিভিন্ন অবস্থার যিকির ও দোয়া শেখানো ৮৫

সন্তানকে কুরআন কারীম মুখস্ত করা	৮৬
দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দোয়া মুখস্ত করানো	৮৭
আমল বা কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা	৮৮
সন্তানের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা	৮৯
সন্তানদেরকে মন্দ জিনিস থেকে বাঁচানো	৯০
বাচ্চাদেরকে খেলাধুলার জন্য ভালো উপকারী সামগ্রী প্রদান করা	৯০
কৈশোরে পদার্পণ ও সঠিক নির্দেশনা প্রদান	৯১
সন্তানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা	৯২
অতিরিক্ত সাজসজ্জা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা	৯২
কষ্ট সহ্য করা পরিশ্রমে অভ্যস্ত করে তোলা	৯৩
অতিরিক্ত কথাবার্তা,খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম থেকে বিরত রাখা	৯৩
নামাজের প্রতি আগ্রহী ও যত্নবান করে তোলা	৯৪
সন্তানের ঝোঁক,প্রবণতা ও আগ্রহের বিষয় জানার চেষ্টা করা	৯৫
মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস জাগানো	৯৭
সন্তানের সাথে পরামর্শ করা	৯৭
কিছু কিছু দায়িত্ব সন্তানের উপর অর্পণ করা	৯৮
সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের অভ্যাস তৈরি করা	৯৯
সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা তৈরি করা	৯৯
বয়সের প্রতি খেয়াল রেখে আচার-ব্যবহার করা	১০০
সন্তানদের সময় দেওয়া	১০০
সন্তানের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা	১০১
সন্তানের কাছে স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশ করা	১০২
সন্তানদের জন্য খরচ করা	১০৩
সন্তানের মধ্যে ত্যাগের স্পৃহা জাগ্রত করা	১০৩
সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা	১০৪
সন্তানের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা	১০৫
সন্তানের ভালো বন্ধুদের সম্মান ও স্নেহ করা	১০৬
খারাপ বন্ধুদের প্রভাব থেকে বাঁচানো	১০৭

অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করা	১০৭
যে কোন ভুলকে বড় করে না দেখা	১০৮
সন্তানদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া	১০৮
শাসন করা ও শাস্তি প্রদান	১০৯
কঠোরতার পাশাপাশি নম্র আচরণ করা	১১০
পিতা-মাতার পারস্পরিক সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকা	১১১
তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভয় করা	১১২
আদর্শ মাদরাসা ও স্কুল নির্বাচন করা	১১৩
ঘরোয়া তালীম এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা	১১৪
বাচ্চাদের জন্য ব্যক্তিগত পাঠাগার বা লাইব্রেরী তৈরি করা	১১৪
সন্তানকে ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া	১১৫
সন্তানকে সৎ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত রাখা	১১৬
মেয়েদেরকে ধর্মীয় ও পার্থিব জরুরী বিষয়াদি শেখানো	১১৭
মেয়েদেরকে একা একা বাইরে বের হতে না দেওয়া	১১৭
ভিন্ন লিঙ্গের বা বিজাতীয় সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বিরত রাখা	১১৮
বৈরী মেলামেশা থেকে দূরে রাখা	১১৯
উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করিয়ে দেওয়া	১২০
সন্তান প্রতিপালনের সুফল লাভের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা	১২১
নিরাশ না হওয়া	১২১
ভালো কাজে শিশুদের সহযোগিতা করা	১২২
শিশুদের ভালো কাজের কথা স্মরণ রাখা	১২২
বিজ্ঞজনের সাথে পরামর্শ করা	১২৩
সন্তান প্রতিপালন বিধায়ক উপকারী বই-পুস্তক অধ্যায়ন করা	১২৩
সন্তানের উত্তম প্রতিপালনের প্রতিদান ও সওয়াবের কথা স্মরণ রাখা	১২৪
লালন পালনের ভুল-ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি স্মরণ রাখা	১২৫
শেষ কথা	১২৬

শুরুর কথা

সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মা-বাবার জন্য একটি বড় নেয়ামত। তারা ঘরের আলো, অন্তরের প্রশান্তি। মা-বাবার ভালোবাসা ও আদরের প্রাণকেন্দ্র।

সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে পিতা-মাতা জিজ্ঞাসিত হবেন। তাই সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক। তাদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শেখানোর ফিকির করা জরুরি। তাদেরকে সঠিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপালনে ত্রুটি করা আমানতের খেয়ানত করার নামান্তর।

মা-বাবার কোল এবং ঘর হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাই মা-বাবার প্রতিটি কাজ, চিন্তা-চেতনা ও আচার-ব্যবহার সবার আগে সন্তানের ওপরই প্রভাব ফেলে। এদিকে লক্ষ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

অর্থ : প্রতিটি নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয় ফিতরতের উপর (তথা সত্য

গ্রহণের স্বভাব বা যোগ্যতা নিয়ে)। তবে পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।[6]

কোন ঘর জাতিকে উপহার দেয় মহান সমাজ-সংস্কারক, নেতা বা পথপ্রদর্শক? সেই ঘর যেখানে আল্লাহ তাআলার ভয় বিরাজমান। যেখানে নবীজির সুন্নাহ অনুসরণের অধীর আগ্রহ আছে। ইসলামের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা আছে। হালাল-হারামের ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতা রক্ষা করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও ভালোবাসার চর্চা হয়। এমন ঘরই গড়ে তোলে যোগ্য নেতৃত্ব।

পক্ষান্তরে যে ঘরে ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবেশ নিম্নমানের, সেখান থেকে জন্ম নেয় ভিন্ন প্রজন্ম। তারা হয়ে ওঠে দেশ ও জাতির জন্য নিন্দার কারণ। সমাজের জন্য বয়ে আনে নানান অভিশাপ।

এটাই হলো বাস্তবতা। মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, সাধারণ জনগণ এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব সন্তানের মাঝে প্রকাশ পায় অনেক পরে। তার অনেক আগেই তারা প্রভাবিত হয় পিতা-মাতার দীক্ষায়। প্রভাবিত হয় নিজ বাসগৃহের পরিবেশে। তাদের সভ্য অথবা অসভ্য হওয়ার পিছনে পিতা-মাতার ভূমিকাই থাকে সবচেয়ে বেশি।

রাস্তাঘাটে অযথা ঘুরে বেড়ানো বখাটে ছেলেদের দিকে তাকান। তাদের ধর্মীয়, চিন্তাগত ও চারিত্রিক অবক্ষয় লক্ষ করুন। তাদের ইসলাম-বিদ্বেষী জীবনধারা দেখুন। এই চিন্তাগত অবক্ষয় ও বিভ্রান্তির কারণ খুঁজলে কী পাবেন?

অন্যতম কারণ হবে, পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসার নামে সন্তান প্রতিপালনে তাদের বিভিন্ন বিচ্যুতিমূলক আচরণ। এমনকি তাদের

---

6. সহীহ বুখারী, হাদিস : ১৩৮৫

পোশাকেও ফুটে ওঠে এই ধর্ম-বিদ্বেষের ছাপ। চারিত্রিক অবক্ষয়ের প্রকাশ।

সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর মর্ম একেবারে স্পষ্ট। এখানে দর্শনশাস্ত্রের কোনো দুর্বোধ্য বা সূক্ষ্ম তত্ত্ব পেশ করা হয়নি। বরং সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি ও অবহেলা সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে সেদিকেই সামান্য দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। অনেক মা-বাবা যেগুলোর প্রতি লক্ষই রাখেন না। আবার অনেকে জেনে-বুঝেও না জানার অসংগত চেষ্টা করেন। এই অবহেলাকে সন্তান-প্রতিপালনের কৌশল বলেন। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার নাম দিয়েও চালিয়ে দিতে চান।

এরপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অত্যন্ত সহজভাবে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক কিছু নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মীয়, চিন্তাগত, চারিত্রিক ও দৈহিক গঠনসহ সার্বিক বিবেচনায় সন্তানের যথাযথভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এগুলো খুব উপকারী।

আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো সেসব মা-বাবার অন্তরে নাড়া দেওয়া যারা নিজেদের সন্তানের সঠিক প্রতিপালনের ব্যাপারে উদাসীন। সেসব মা-বাবাকে সুন্নাহর আলোকে পথপ্রদর্শন করা যারা আদর্শিকভাবে সন্তান প্রতিপালনের আগ্রহ রাখেন। এই আলোচনা যদি সে সকল মা-বাবার জন্য সঠিক পথের দিশারি হয়, যারা নিজেদের সন্তানের উত্তম জীবন-যাপন ও আদর্শবান হওয়ার আশা রাখেন, তাহলে এই অধমের মেহনত ফলপ্রসূ হবে।

কিতাবটি লেখার ক্ষেত্রে আমি অধম ব্যক্তিগতভাবে কুরআন-সুন্নাহ রিসার্চ করার পাশাপাশি আরবের অনেক বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ আলেমদের রচিত বই-পুস্তকও অধ্যয়ন করেছি। যেমন: শায়খ মুহাম্মাদ মুনাজ্জিদ লিখিত "আখতারুন তুহাদ্দিদুল বুয়ূত", ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হুসাইন লিখিত "হুসুনুনা মুহাদ্দাদাতুন মিন দাখিলিহা",

শায়খ ফরিদ তুনা-এর রচিত "সুমূমুন আ'লাল হাওয়া" এবং শায়খ মুহাম্মাদ মুনাজ্জিদ লিখিত "কাইফা নুরাব্বি আওলাদানা" ইত্যাদি।

বিশেষত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আল-হামদ লিখিত "আত-তাকসির ফি তারবিয়াতিল আওলাদ" নামক কিতাব থেকেও উপকৃত হয়েছি। আমি এসব কিতাবের লেখকবৃন্দের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাদরাসায়ে হুসাইনিয়া তালীমুল ইসলাম, গিয়ারি, দারভাঙ্গা (বিহার)-এর পরিচালক মাওলানা নুরুল ইসলাম মাযাহিরীর। কারণ তিনি নিজের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে এই কিতাবটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কাজে বারাকাত দান করুন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করুন। সমাজের জন্য নূরের মিনার বানিয়ে দিন।

সবশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, তিনি যেন এই কিতাবকে কবুল করে জাতির জন্য উপকারী করে তোলেন। কিতাবটি আমার জন্য এবং আমার মা-বাবা ও আমার উসতাযগণের জন্য আখেরাতের পুঁজি বানান।

ربنا! تقبل منّا. إنّك أنت السميع العليم. آمين!

মুহাম্মাদ রাজিউর রহমান কাসেমী
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া শান্তাপুরাম, কেরালা, ভারত
০১-০৫-১৪৩২ হিজরী
০৬-০৪-২০১১ ঈসায়ী

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক
৩৮টি ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা
করা হয়েছে

প্রাককথন :

সন্তান লালন-পালনে অবহেলা না করা

ইসলাম একটি ধার্মিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের চেষ্টা করে। তাই একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এ বিষয়েও উদ্বুদ্ধ করা উচিত, তারা যেন শুধু নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগী না হয়। বরং নিজেদের উপর অন্যদের যে অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলোও যথাযথভাবে পূরণ করার প্রতি মনোনিবেশ করে। কার ওপর কী দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, ইসলাম স্পষ্টভাবে সবাইকে তা জানিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেককে নিজ দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে।

ইসলাম সন্তানের ওপরও দায়িত্ব আরোপ করেছে। তারা নিজেদের

পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাঁদের খেদমত করে

তাঁদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

অর্থ : আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। [7]

এমনকি তারা মনে কষ্ট পাবেন এমন কোনো আচরণও যাতে তাদের সাথে না করা হয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

অর্থ : তুমি তাদেরকে (বাবা-মাকে) 'উফ' (বিরক্তি প্রকাশক কোনো শব্দ) বলো না। [8]

অন্যদিকে, ইসলাম পিতা-মাতার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তারা সন্তানের শারীরিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বিকাশের যথাযথ ব্যবস্থা করবে, তাদের সুশিক্ষা ও উত্তম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং তাদেরকে এমন পথে পরিচালনা করবে যে পথে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি রয়েছে। তাঁর অসন্তুষ্টির পথে নয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাচাঁও। [9]

---

7 সূরা আহকাফ : ১৫

৪ সূরা বনী ইসরাইল : ২৩

9 সূরা তাহরীম : ০৬

সন্তান লালন-পালনের এই দায়িত্বগুলো পিতা-মাতার জন্য আমানত। আর আমানত যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থ : তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন (তোমাদের কাছে গচ্ছিত) আমানতসমূহ সেগুলোর পাওনাদারদের নিকট পৌঁছে দাও। [10]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমানতের খেয়ানত করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে ইরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতেরও খেয়ানত করো না। [11]

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ আমাদের সমাজে এমন অনেক সন্তান রয়েছে যারা নিজ পিতা-মাতার অধিকারগুলো সঠিকভাবে আদায় করছে না। তদ্রূপ অনেক পিতা-মাতা আছেন যাঁরা সন্তানের ব্যাপারে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলো আদায়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বরং প্রতিনিয়ত আমানতের খেয়ানত করছেন।

---

10 সূরা নিসা : ৫৮

11 সূরা আনফাল : ২৭

আমরা এবার একে একে সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত কিছু ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করছি। যেগুলো আমাদের সমাজের অধিকাংশ অভিভাবকের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ সমাজে অসভ্য ও দুষ্ট যুবকের সংখ্যা দিন দিন কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা তাদের অভিভাবকদের জন্য বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ ও দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়ে উঠছে।

আমরা সন্তান প্রতিপালনে এসব ভুল-ত্রুটি আলোচনা করে সম্মানিত অভিভাবকদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। তাঁরা যেন এ ক্ষেত্রে মনোযোগী হন। তাঁদের এ সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। এ বইয়ের আলোচনা আশা করি শুধু তাঁদের সন্তানের নয়, বরং গোটা সমাজের জন্যই উপকারী হবে। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

প্যারেন্টিংয়ের ৩৮টি ভুল

১. ছোটখাটো বিষয়ে বাচ্চাদের ভয় দেখানো

শৈশবে শিশুদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন থাকে। তাই এ সময় সে শুধু শিখে। জ্ঞান বা তথ্যের অভাবে এই বয়সে কোনো কিছু যাচাই করার ক্ষমতা তার থাকে না। সঠিক-ভুলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। বিচার-বিবেচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। ফলে মা-বাবা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে যা শোনে, তা-ই তার মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। বিনা প্রশ্নে তা বিশ্বাস করে নেয়। পরে বড় হয়ে সঠিক তথ্য জানার পরেও শৈশবের শেখা কথাগুলো মনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে।

কিন্তু অনেক মা-বাবা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ রাখেন না। শিশু কান্না করলে তাকে দ্রুত চুপ করানোর জন্য বা জেদ ধরলে সহজে মানানোর জন্য তারা ভুল পথ বেছে নেন। ভয় দেখানোর মতো ক্ষতিকর পন্থা অবলম্বন করেন।

কখনো জিন, ভূত, পরি ইত্যাদি অদৃশ্য বস্তুর ভয় দেখান। কখনো কুকুর, সিংহ, চিতাবাঘ বা সাপের মতো হিংস্র প্রাণীর ভয় দেখান। আবার কখনো গুণ্ডা, পুলিশ, অন্ধকার বা ইনজেকশনের ভয় দেখান।

কখনো বা বাবা-মা সন্তানদেরকে বলেন, চুপ না করলে জিন এসে ধরে নিয়ে যাবে। বা বলেন, এখনই পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেব। এর ফলে শিশুর কোমল মনে এসব জিনিসের ভয় গভীরভাবে ঢুকে যায়। আর এই ভয় সারাজীবনের জন্য মনে গেঁথে থাকে। মুছে ফেলা যায় না। পরিণামে শিশুরা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার বদলে সারাজীবন কাপুরুষ ও ভীতু হয়ে থাকে। ছোটখাটো বিষয়েও ভয় পেতে শুরু করে। আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

অনেক মা-বাবা আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। তারা শিশুদের স্কুল, মাদরাসা বা ডাক্তারের ভয় দেখান। বলেন, পড়তে না চাইলে মাদরাসায় পাঠিয়ে দেব, সেখানে মার খেয়ে মরবে। বা বলেন, শুনছ না তো, ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ইনজেকশন দিয়ে দেব। ফলে

তারা এসব উপকারী স্থানকেই ভয় পেতে শুরু করে। জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা-দীক্ষা ও জরুরি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয়ের প্রতি ভীতি তৈরি হয়। যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. সন্তানকে বিদ্রোহী ও বাচাল করে তোলা

সকল মা-বাবার কাছেই শিশুদের দুষ্টুমি প্রিয় ও আকর্ষণীয়। এতে তাদের আনন্দ হয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের কথাবার্তা যেন কখনো অশালীন না হয়। তাদের দুষ্টুমি যেন অভদ্রতায় পরিণত না হয়। সীমা যেন অতিক্রম না করে।

অনেক মা-বাবা বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দেন না। বাচ্চাদের অভদ্র আচরণ বা অশ্লীল কথাবার্তা শুনেও সংশোধনের কোনো চেষ্টা করেন না। এমনকি তাদের থামানোরও প্রয়োজন বোধ করেন না।

ফলে শিশুরা বড়-ছোটর কোনো তোয়াক্কা না করে যা ইচ্ছা তাই করে। কারো সম্মান বা মর্যাদার বিবেচনা করে না। মনে যা আসে মুখে তাই বলে। মা-বাবাও এসব আচরণ দেখে থামান না। বরং মনে করেন, এটাই সাহস। এটাই তেজ। গর্বের সাথে বলেন, আমার ছেলে কাউকে ভয় পায় না। আমার ছেলে কারো কাছে মাথা নত করে না।

আরও ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বিষয় হলো, কখনো কখনো মা-বাবা নিজেরাই সন্তানকে এমন দুঃসাহস ও বেয়াদবি শেখান। কাউকে জবাব দেওয়ার জন্য সন্তানকে হাতিয়ার বানান। বলেন, যাও তো, অমুককে গিয়ে এই কথাটা বলে এসো। সে যদি কিছু বলে, তাহলে তার বাবা-মা বা পরিবারের এই এই দোষ-ত্রুটি ধরে দেবে।

এভাবে তারা সন্তানকে নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতা ও প্রতিহিংসার

হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেন। এ এক ভয়াবহ ভুল। যা শুধু সন্তানের চরিত্র নষ্ট করে না, বরং পুরো পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এ ধরনের আচরণ দ্রুত সংশোধন করা অত্যন্ত জরুরি।

৩. অতি আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত করে তোলা

প্রত্যেক মা-বাবাই চান তাদের সন্তানের জন্য আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে। স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে তাদের বড় করতে। এটা স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়। কিন্তু অতিরিক্ত স্নেহ-ভালোবাসা ও মাত্রাতিরিক্ত আরাম-আয়েশ শিশুদের মধ্যে নানা মন্দ স্বভাব ও দুর্বলতার জন্ম দেয়।

কারণ এতে তারা অতিরিক্ত আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সামান্য কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। একটু অসুবিধা হলেই অস্থির হয়ে যায়। ছোট ছোট ইচ্ছাগুলোও তাদের কাছে অপরিহার্য প্রয়োজন মনে হতে থাকে। পূরণ না হলে মন খারাপ করে বসে। একসময় তারা শুধু নিজের আরামের কথাই ভাবে। অন্যের কষ্ট বা অসুবিধার কথা চিন্তা করে না। ভবিষ্যতে এই মানসিকতা তাদের চরম স্বার্থপর করে তোলে।

তাদের মনে থাকা দয়া-অনুকম্পার স্বাভাবিক অনুভূতি ধীরে ধীরে মুছে যায়। অন্যের ব্যথা-বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জীবনের কঠিন সময় মোকাবেলা করার সাহস ও মানসিক শক্তি থাকে না। সামান্য বিপদে ভেঙে পড়ে। সমাজের কল্যাণের কথা না ভেবে শুধু নিজের ও নিজের কাছের মানুষের স্বার্থ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। ফলে তারা সমাজের জন্য উপকারী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

৪. সকল আবদার পূরণ করা

অনেক মা-বাবার অভ্যাস হলো বাচ্চারা কোনো কিছুর আবদার করলেই তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে দেন। মনে হয় যেন তারা সন্তানের সব ইচ্ছা পূরণ করতেই সবসময় প্রস্তুত। কিন্তু তারা একবারও ভাবেন না, জিনিসটা এখন সত্যিই প্রয়োজন কি না। পরে দিলে কোনো সমস্যা হবে কি না। সন্তানের জন্য এটি আদৌ উপকারী কি না। বরং এ জাতীয় অন্য কিছু তার জন্য বেশি উপকারী হবে কি না। অনেকে তো এই উদাসীনতাকেই সন্তানের প্রতি ভালোবাসার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সব আবদার মেনে নেওয়া সন্তানের মধ্যে অনেক মন্দ স্বভাব জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে তৈরি হয় অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় খরচের অভ্যাস। তৈরি হয় অন্যায় পথে অর্থ ব্যয় করার প্রবণতা । এটি তার জন্য, বিশেষত পরবর্তী জীবনের জন্য চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫. কাঁদলেই সব কথা মেনে নেওয়া

অনেক সময় শিশুরা মা-বাবার কাছে নানা আবদার করে। কিন্তু যৌক্তিক কোনো কারণে বা অন্য কোনো সমস্যার জন্য সেসব আবদার পূরণ করা সম্ভব হয় না। তখন বাচ্চারা কান্নাকে তাদের আবদার পূরণের হাতিয়ার বানায়। জোরে জোরে কান্নাকাটি শুরু করে। সন্তানের প্রতি মমতার টানে অথবা তাদের কান্না থেকে মুক্তি পেতে শেষমেশ মা-বাবা বাধ্য হয়ে তাদের আবদার মেনে নেন।

এর পরিণতি কী দাঁড়ায়? শিশুরা বুঝে যায়, কান্নার মাধ্যমে যেকোনো কিছু আদায় করা সম্ভব। তখন তারা প্রতিটি আবদার, প্রতিটি দাবি আদায়ের জন্য কান্নাকে একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে ব্যবহার

করতে শুরু করে। এই অভ্যাস ধীরে ধীরে তার স্বভাবে মানসিক দুর্বলতা ঢুকিয়ে দেয়। তৈরি হয় অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতা। পরবর্তী জীবনেও এই দুর্বলতা তাকে তাড়া করে ফেরে।

৬. পরিণত বয়সের আগেই গাড়ি বা সাইকেল ইত্যাদি কিনে দেওয়া

অনেক মা-বাবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই সন্তানকে মোবাইল ফোন, সাইকেল বা খেলনা গাড়ি ইত্যাদি কিনে দেন। এর পেছনে মূলত দুটি কারণ কাজ করে।

এক. শিশুর জেদ বা বারবার পীড়াপীড়ি।

দুই. ঘরের ছোটখাটো কাজ যেন সহজেই তাকে দিয়ে করানো যায়।

মা-বাবা ভাবেন, সাইকেল কিনে দিলে খুশি হয়ে সে কাজটা করে দেবে। অথবা ভাবেন, এতে তার খেলার সুবিধা হবে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে এসব কিনে দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে তাকে অসৎ পথে নিয়ে যায়।

বয়সের আগেই মোবাইল বা সাইকেল পেয়ে অনেক শিশু সেগুলোর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে কাটাতে শুরু করে। কেউ খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে যায়। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। স্কুল-মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকতে শুরু করে।

কখনো তারা নিজেদের অজান্তে বা অসতর্কতায় সাইকেল বা গাড়ির মাধ্যমে অন্যকে ভোগান্তি কিংবা দুর্ঘটনার কবলে ফেলে দেয়। অনেক সময় নিজেই বিপদে পড়ে যায়।

৭. প্রয়োজন-অতিরিক্ত শাসন করা

সন্তান যদি কোনো ভুল করে এবং তাকে সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে শাসন করা উচিত। এটা তার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, ঘৃণা নয়। কিন্তু কিছু মা-বাবা ছোট-বড় প্রতিটি ভুলের জন্যই মারধর করাকে জরুরি মনে করেন। আবার যখন শাসন করেন, তখন সীমা ছাড়িয়ে যান। মাত্রা বজায় রাখেন না। অনেক মা-বাবার তো অভ্যাসই হয়ে যায় যে তারা প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে সন্তানকে ধমক ও তিরস্কার করতে থাকেন। বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকেন।

শিশুদের সাথে এ ধরনের আচরণ কাম্য নয়। কারণ এতে শিশুদের মনে পিতা-মাতার প্রতি অভিমান তৈরি হয়। কখনো কখনো ঘৃণাও জন্মে। বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে ওঠে। পাশাপাশি অন্যের ওপর জুলুম বা সহিংসতার প্রবণতা জন্ম নেয়। এভাবে তারা নিজেরাই অত্যাচারী হয়ে বেড়ে ওঠে।

৮. স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত রাখা

শিশুদের সবচেয়ে বড় চাহিদা হলো মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা। কিন্তু অনেক মা-বাবা নিজেদের আচরণের মাধ্যমে সন্তানকে এটা বোঝাতে পারেন না যে, তারা তাকে কতটা ভালোবাসেন। তারা হয়তো অন্তর থেকেই সন্তানকে ভালোবাসেন, কিন্তু সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন না। একসময় বিষয়টি সন্তানের মনে গভীর ক্ষত হিসেবে থেকে যায়। এটি তার জন্য ভীষণ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার কিছু মা-বাবা স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেন ঠিকই। কিন্তু শাসনের প্রয়োজন হলে স্থান-কাল-পরিবেশের বিবেচনা না করেই

সহপাঠী বা অন্যদের সামনে তাকে ধমক দেন। এমনকি মারধরও করেন। ফলে সন্তানের মনে এই ভুল ধারণা তৈরি হয় যে, মা-বাবা হয়তো তাকে ভালোবাসেন না। তাছাড়া এ ধরনের আচরণ তাকে সহপাঠী ও অন্যদের সামনে অপমানিত ও ছোট করে দেয়। সে নিজেকে অন্যদের তুলনায় ছোট ও তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। যা ভবিষ্যতে তার উন্নত জীবন গঠনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তানের ব্যাপারে এই ধারণা করা একেবারেই ঠিক নয় যে, ওরা তো এখনো ছোট। এখনো ওর বুঝবুদ্ধি কিছুই হয়নি। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, ঘৃণা-ভালোবাসা, মান-অপমান—এই অনুভূতিগুলো শিশুদের মনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কখনো যদি তারা নিজেদের অপমানের ব্যাপারটি টের পায়, তাহলে এ বিষয়টি একসময় তাদের মধ্যে গভীর হীনমন্যতা তৈরি করে। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

আর যদি কখনো নিজেকে ভালোবাসা-বঞ্চিত অনুভব করে, তাহলে তার মনে মা-বাবার প্রতি তীব্র অভিমান জন্মায়। তারা অন্য কোথাও ভালোবাসা খুঁজে বেড়ায়। খারাপ সঙ্গীদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর বঞ্চিত হওয়ার এই গভীর অনুভূতি নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়।

৯. সন্তানের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা

অনেক মা-বাবা আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের জন্য ব্যয় করতে কৃপণতা করেন। শরীরের জন্য উপকারী এমন কোনো খাবারের প্রতি সন্তান আগ্রহ দেখালেও তারা নিজেদের কৃপণতার কারণে তা কিনে দিতে চান না। এমনকি শীত-গ্রীষ্মে আবহাওয়ার উপযোগী প্রয়োজনীয় পোশাকও কিনে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কেউ তো আবার সম্পূর্ণভাবে শরীর ঢাকা যায় এমন পরিমাণ কাপড় কিংবা পায়ের জুতা পর্যন্ত সন্তানের জন্য ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক নন।

এ ধরনের কৃপণতা সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাদের মনে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি হয়। তারা অন্যের কাছে হাত পাততে শুরু করে। লজ্জা-শরম হারিয়ে ফেলে। বাড়ি বা বাড়ির বাইরে থেকে চুরি করতে বাধ্য হয়। খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা শুরু করে। এই বদঅভ্যাসগুলো ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দেয় অপরাধের অন্ধকার জগতের দিকে। একসময় তার পক্ষে সৎ পথে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যায়।

১০. অতিরিক্ত ভালো ধারণা পোষণ করা

অনেক মা-বাবা নিজ সন্তানের ব্যাপারে অন্ধভাবে অতিরিক্ত ভালো ধারণা রাখেন। মনে করেন, তাদের সন্তান কখনো কোনো ভুল করতে পারে না। ফলে তাদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। তার অবস্থার ব্যাপারে কোনো খোঁজখবরও রাখেন না। এমনকি তার বন্ধু-বান্ধব কারা, তারা কেমন—এ ব্যাপারেও কোনো ধারণা রাখেন না।

এমনিভাবে সন্তানের ব্যাগ, আলমারি বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কখনো খুলে দেখেন না। কখনো যদি তারা বলে, আমি বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি, তখন যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেন না। বাস্তবেই সে বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে নাকি অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে? কিংবা বন্ধুর বাসায় গেলেও সে বন্ধু কেমন? তার পরিবার কেমন? তার চরিত্র ও আচার-আচরণ কেমন? এসব বিষয়ের প্রতিও তারা মোটেও খেয়াল রাখেন না।

অনেক মা-বাবার এই অসতর্কতা ও উদাসীনতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কখনো কোনো সৎ বা বিচক্ষণ ব্যক্তি তাদের কাছে সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ করলে কিংবা কোনো ভুল কাজের খবর দিলে, উল্টো তারা সন্তানের পক্ষ নিয়ে সেই মানুষটির ওপরই সন্দেহ

করে বসেন।

ভাবেন, সে হয়তো আমার সন্তানকে ভালো চোখে দেখে না! তার প্রতি বিদ্বেষ রাখে! এভাবে তারা সন্তানকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষটিকেই দোষারোপ করেন।

এটা চরম পর্যায়ের অবহেলা এবং দায়িত্বহীনতা। যা একসময় সন্তানকে নানা মন্দ স্বভাব ও কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে দেখা যায়, কেউ খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে বিপথে যাচ্ছে। কেউ মাদক বা অন্য ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। কেউ অশালীন বই বা ম্যাগাজিন পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। কেউ জুয়া বা অন্যান্য খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে।

পরে যখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখনই শুধু মা-বাবার বিবেক জাগে। তখন সন্তানকে সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু তত দিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। তখন আর তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় না।

১১. সন্তানকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখা

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবার আচরণে একটি ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। তারা সন্তানের ব্যাপারে সবসময় নেতিবাচক ও মন্দ ধারণা পোষণ করেন। সন্তানের প্রতিটি কথা ও কাজকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাদের অবিশ্বাসের মাত্রা এতটাই প্রবল যে, সন্তানকে তারা নূন্যতম বিশ্বাসটুকুও করতে চান না। বরং পান থেকে চুন খসলেই তাকে বিভিন্ন বিষয়ে দোষারোপ করতে থাকেন।

এমন মা-বাবা সন্তানের প্রতিটি পদক্ষেপের হিসাব খুব কঠোরভাবে নেন। তাদের জেরা করার ধরণ দেখে মনে হয়, যেন কোনো দাগী অপরাধীকে কাঠগড়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পিতা-মাতার এমন রুক্ষ ও সন্দেহপ্রবণ আচরণ সন্তানের কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি

করে। ফলে মা-বাবার প্রতি তাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কমে যায়। এর পরিবর্তে সেখানে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি দানা বাঁধতে শুরু করে।

প্রতিটি কাজে সন্তান নিজেকে তখন পরাধীন ও শিকলবন্দী মনে করে। অহেতুক সন্দেহের এই বিষবাষ্প একসময় সন্তানের বিবেক-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। ফলে সে নিজের ওপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

১২. সন্তানদের মাঝে বৈষম্য করা

সন্তানদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-বাবার আরেকটি মারাত্মক ভুল হলো সন্তানদের মাঝে বৈষম্য করা। অর্থাৎ কাউকে স্নেহ-ভালোবাসা বা উপহার বেশি দেওয়া, আর কাউকে কম দেওয়া বা বঞ্চিত করা। ইসলামি শরিয়াহর দৃষ্টিতে সন্তানের মাঝে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মা-বাবার এমন অবিচার ভাই-বোনদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরায়। তাদের মাঝে ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা ও অহংকারের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা বড় ছেলেকে বাড়ি-গাড়ি বা জায়গা-জমি লিখে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়ার অজুহাত পেশ করেন। বলেন, 'ছোটদের সব প্রয়োজন তো আমরাই পূরণ করছি। তারা বড় হলে তাদেরকেও দেব ইনশাআল্লাহ।'

তাদের এমন যুক্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইসলামে প্রতিটি সন্তানের অধিকার সমান। তাছাড়া ছোট সন্তানরা বড় হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতা জীবিত থাকবেন কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই কিংবা ততদিন পর্যন্ত তাদের সম্পদ ও স্বচ্ছলতা থাকবে কি না, তাও কেউ জানে না।

একইভাবে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও অন্য সন্তানদের

মতো পিতা-মাতার সম্পদে তাদের অধিকার বহাল থাকে। সুতরাং মা-বাবা যদি অন্য কোনো সন্তানকে সম্পদ বা উপহার দিয়ে থাকেন, তবে বিবাহিত মেয়েরাও সেই সম্পদের সমপরিমাণ অংশীদার হবে।

১৩. প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বিবাহের ব্যবস্থা না করা

ছেলে যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তার বিবাহের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের উচিত বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া। যদি ছেলের বিবাহের খরচ ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বহনের সক্ষমতা থাকে এবং কোনো বাস্তবিক জটিলতা না থাকে, তবে দেরি করা ঠিক নয়। এ অবস্থায় তার বিবাহ নিয়ে গড়িমসি করা বা উদাসীন থাকা মা-বাবার জন্য একটি বড় ভুল সিদ্ধান্ত। উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা না করা হলে, ছেলের বড় ক্ষতি হতে পারে। মা-বাবার এই অবহেলা একসময় তাকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সে নানাবিধ ফিতনা ও পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তার ইহকাল ও পরকাল—উভয় জগতই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১৪. উপার্জন ভোগ করতে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিবাহে বিলম্ব করা

মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হলে কালক্ষেপণ না করে তার জন্য দ্বীনদার ও উপযুক্ত পাত্র খোঁজ করা এবং বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা অনেক অভিভাবকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি আরও জঘন্য রূপ ধারণ করে যখন এই বিলম্বের মূল কারণ হয় মেয়ের উপার্জন ভোগ করা।

অনেক মা-বাবা এই ভয়ে বিবাহ দেন না যে, মেয়ে পরের ঘরে চলে গেলে তার চাকরি বা উপার্জনের টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ সামনে বাড়িঘর নির্মাণ বা সংসারের প্রয়োজনে সেই টাকার খুব দরকার।

এভাবে পার্থিব স্বার্থের জন্য মেয়ের বিবাহ আটকে রাখা অনেক বড় অন্যায়। এটি তাকে বিভিন্ন ফিতনা ও প্রলোভনের মুখে ঠেলে দেয়। কখনো বা তার সতীত্ব হুমকির মুখে পড়ে। এছাড়া বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে উপযুক্ত ও কাঙ্ক্ষিত পাত্র থেকেও সে বঞ্চিত হয়।

১৫. ছেলে-মেয়ের জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ তালাশ না করা

সন্তানের বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবা দ্বীনদারি, উত্তম চরিত্র, নম্রতা-ভদ্রতা এবং পাত্র-পাত্রীর মানসিক মিলের বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেন। তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে কেবল পার্থিব মান-সম্মান, পদ-পদবি এবং ধন-দৌলত। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে কেবল দুনিয়াবি চাকচিক্য ও ক্ষমতার বিচার করেন। দ্বীনদারি ও আখলাকের দিকটি বিবেচনায় রাখেন না। অথচ এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটিই তাদের বিবেচনার বাইরে থেকে যায়।

বাস্তবিক অর্থে, এমন মনোভাবের কারণে পিতা-মাতার ওপর সন্তানের যে আমানত ও অধিকার রয়েছে, তা বিনষ্ট হয়। এটি সন্তানের সাথে এক প্রকার খিয়ানত। অনেক সময় ভুল মানদণ্ডে নির্বাচন করা এই সম্পর্কই সন্তানের জন্য লাঞ্ছনা বয়ে আনে। পরবর্তী জীবনে তা চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৬. সন্তানের অসুন্দর নাম রাখা

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা তার জন্মগত অধিকার। এর বিপরীতে

অসুন্দর ও অনুপযোগী নাম রাখা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একটি বড় ত্রুটি। এটি সন্তানের ওপর জুলুমের নামান্তর। মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের দ্বারা সংঘটিত গুনাহ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত, এমন গুনাহ যা করার পর তওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। সেই গুনাহের প্রভাবও মুছে যায়।

দ্বিতীয়ত, এমন ভুল বা গুনাহ যা তওবা করলে মাফ হয় ঠিকই, কিন্তু তার নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে যায়। সন্তানের অসুন্দর ও অশালীন নাম রাখা এই দ্বিতীয় প্রকার ভুলের অন্তর্ভুক্ত।

কারণ পরবর্তীতে মা-বাবা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেও সন্তানের নাম পরিবর্তন করা সবসময় সহজসাধ্য হয় না। ধীরে ধীরে সন্তান যখন বড় হয়, সে তার মন্দ নামের প্রভাব অনুভব করতে পারে। এমনকি তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও এই অরুচিকর নামের কারণে তাকে লজ্জিত হতে হয়। তাই নাম রাখার ক্ষেত্রে অবশ্যই উত্তম, অর্থবহ ও শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন করা উচিত।

নাম রাখার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে নানাবিধ ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

১. কখনো পিতা-মাতা অজ্ঞতাবশত এমন নাম রাখেন, যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বা হারাম। এর মধ্যে রয়েছে এমন কিছু নাম যা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই খাস। যেমন—খালিক (সৃষ্টিকর্তা), রাজ্জাক (রিজিকদাতা) ইত্যাদি। আবার এমন নামও রাখা হয় যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি বোঝায়। যেমন—আব্দুল হুসাইন (হোসাইনের গোলাম)।

২. এমন নাম রাখা যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। অথবা যা সাধারণত কাফের-মুশরিক ও বিধর্মীরা ব্যবহার করে থাকে। যেমন—জর্জ, ডেভিড, মাইকেল, লক্ষণ, রাম, গীতা ইত্যাদি।

৩. কিছু নাম উচ্চারণের দিক থেকেই অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ।

যেমন—গাড্ডু, পাপ্পু, ডাবলু ইত্যাদি। এমন কিছু নামও দেখা যায় যা ভবিষ্যতে সন্তানের জন্য উপহাস ও বিদ্রূপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—মাঙ্গালু, আশেক, মাহবুবা, ফাতিন ইত্যাদি।

১৭. মা-বাবা দীর্ঘ সময় ঘরের বাহিরে থাকা

পারিবারিক জীবনে আরেকটি বড় সমস্যা হলো মা-বাবার দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে অবস্থান করা। অনেক বাবা আছেন যারা জীবিকার প্রয়োজনে বা ব্যবসায়িক ব্যস্ততায় দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটান। তারা ঘরে খুব সামান্য সময় দেন। অনেকে আবার বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডা, গল্প-গুজব ও অনর্থক কাজে বাইরে সময় নষ্ট করেন। এ নিয়ে অভিযোগ করলে তারা অজুহাত দেন। তারা বলেন, পরিবারের সুখের জন্যই তো তারা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছেন।

একইভাবে অনেক মা-ও আছেন, যারা সংসারের বাইরে সময় নষ্ট করেন। কেনাকাটা, শপিং কিংবা বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য দিনের উল্লেখযোগ্য সময় তারা বাজার-ঘাট বা প্রতিবেশীর ঘরে কাটিয়ে দেন।

পিতা-মাতার এই অনুপস্থিতি এবং সন্তানের প্রতি অমনোযোগিতা তাদের বিপথগামী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে সন্তানরা একাকিত্বে ভোগে। একসময় তারা বিভিন্ন অন্যায়, অপকর্ম ও বিশৃঙ্খল জীবনযাপনে জড়িয়ে পড়ে।

১৮. রাগ করে সন্তানের জন্য বদদোয়া করা

সন্তান অবাধ্য হলে বা কোনো ভুল করলে অনেক মা-বাবা রাগের বশবর্তী হয়ে যান। রাগের মাথায় তারা সন্তানদের অভিশাপ বা বদদোয়া দিয়ে বসেন। যেমন—'তুই মরিস না কেন!', 'তোর হাত-

পা ভেঙে যায় না কেন!', 'তোর চোখ নষ্ট হোক' ইত্যাদি। এ ধরনের বদদোয়া মুখ থেকে বের হওয়া পিতা-মাতার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বড় একটি ভুল। কারণ দিন-রাতের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ মুহূর্ত আছে, যখন আল্লাহ তাআলা বান্দার দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ না করুন, মা-বাবার মুখ থেকে বের হওয়া সেই অভিশাপ যদি কবুলের মুহূর্তে পড়ে যায়, তবে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বাস্তবে তা ফলে গেলে সারা জীবন চোখের পানি ফেললেও সেই ক্ষতির আর কোনো প্রতিকার হবে না।

তাই বলা হয়, দোয়া হলো তীরের মতো—তা ভালো হোক বা মন্দ। কখনো তা ঠিক নিশানায় লেগে যায়, আবার কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এ কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের জন্য বদদোয়া করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم ...، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

অর্থ : তোমরা তোমাদের নিজেদের ও সন্তানদের এবং সম্পদের ব্যাপারে বদদোয়া করো না। কেননা, হতে পারে তোমরা এমন সময় বদদোয়া করলে, যে সময় দোয়া কবুল করা হয়। আর সেই বদদোয়া কবুল হয়ে গেলো। [12]

১৯. মন্দ কথা ও কাজে অভ্যস্ত করে তোলা

অনেক মা-বাবা সন্তানের সামনে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন। এমনকি নিজেদের কথাবার্তা, চালচলন ও কাজেকর্মে তারা

12 সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩২

কাফের, ফাসিক এবং অসৎ লোকদের অনুকরণ করেন। কখনো কখনো তারা আদর করে বা রাগের মাথায় সন্তানদের মন্দ নামে বা খারাপ উপাধিতে ডাকেন। আপাতদৃষ্টিতে এসব বিষয় তুচ্ছ মনে হলেও, ধীরে ধীরে তা শিশুদের অনর্থক কথাবার্তা ও মন্দ কাজে অভ্যস্ত করে তোলে।

কিছু মা-বাবা তো এক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন করেন। তারা নিজেরাই সন্তানকে কুবাক্য শিখিয়ে দেন। সন্তানকে বলে দেন, 'অমুক যদি তোমাকে কিছু বলে, তাহলে তুমিও তাকে পাল্টা এই গালি দেবে।' এটি সন্তানের মানসিকতা বিষিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

আবার অনেক মা নিজে শালীনতা বজায় রাখেন না। ছোট বা অর্ধউলঙ্গ পোশাক পরেন। এমনকি নিজের অবুঝ সন্তানদেরও বিজাতীয় ও নগ্ন প্রায় পোশাক পরাতে অভ্যস্ত করে তোলেন। এটি চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন, যা বাচ্চাদের লজ্জাবোধ ও চরিত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়।

২০. সন্তানের সামনে গুনাহ করা

সন্তান মূলত পিতা-মাতাকে দেখেই শেখে। কিন্তু অনেক মা-বাবা নিজেরাই নামাজ পড়েন না, কখনো কুরআন কারীম তিলাওয়াত করেন না। অথচ তারা সন্তানের সামনে গান শোনেন কিংবা অশ্লীল সিনেমা, নাটক ও সিরিয়াল দেখার জন্য সারাদিন টিভির সামনে বসে থাকেন। আবার অনেক বাবা দাড়ি রাখেন না, এমনকি মদ-সিগারেট ও নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েন।

কিছু মা আছেন যারা পর্দা করেন না, অর্ধনগ্ন পোশাক পরে অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে এবং বাজার-ঘাটে ঘুরে বেড়ান। পিতা-মাতার এসব কাজ একসময় সন্তানের কাছে 'রোল মডেল' বা আদর্শ হয়ে ওঠে। গুনাহের কাজগুলো তাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হতে

থাকে। একটা সময় তারা এসব কাজকে আর গুনাহই মনে করে না। বরং নিজেরাও অজান্তেই বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে পড়ে।

২১. অশ্লীল ও মন্দ জিনিসপত্র ঘরে নিয়ে আসা

ঘরের পরিবেশ পবিত্র রাখা মা-বাবার দায়িত্ব। কিন্তু অনেক সময় মা-বাবা ঘরে এমন ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা নিয়ে আসেন বা মোবাইলে এমন দৃশ্য দেখেন, যার মধ্যে অশ্লীল ছবি, নগ্ন চিত্র ও নোংরা ভিডিও থাকে। আবার অনেকে শিশুদের দিয়ে ঘরের বা বাইরের দেয়ালে কুরুচিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করান। কিংবা নিজের পড়ার টেবিল বা শোকেসে এমন সব বই সাজিয়ে রাখেন, যার মধ্যে সুস্পষ্ট নোংরা কথাবার্তা ও অশ্লীল ছবি থাকে।

এগুলো ছাড়াও এমন অনেক ক্ষতিকর ও মন্দ জিনিসপত্র ঘরে আনা হয়, যা সন্তানের নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব উপকরণ সন্তানকে বেয়াদব হতে এবং অশ্লীল ও মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সন্তানের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের স্বার্থে এ জাতীয় জিনিসপত্র ঘরে আনা থেকে পরিপূর্ণ বিরত থাকা একান্ত জরুরি।

২২. সন্তানকে সাথে নিয়ে ঘুমানো

অনেক মা-বাবা আছেন যারা সন্তান বুঝমান হওয়ার পরও রাতে ঘুমানোর সময় তাদের নিজেদের সাথে শোয়ান। এটাকে তারা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। তদ্রূপ, অনেক মা-বাবা তাদের ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পরও ভাই-বোনদের এক বিছানায় ঘুমাতে দেন। এ দুটি বিষয়ই সন্তানের উত্তম চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক তো বটেই। এমনকি অনেক সময় তা তাদের

দৈহিক ও মানসিক অবক্ষয়ও ডেকে আনে।

এজন্য মা-বাবার উচিত হলো, সন্তানের বয়স তিন বা সাড়ে তিন বছর হলেই তার জন্য আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা। আর বয়স যখন পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ বছর হবে, তখন ছেলে ও মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বিছানা, কাঁথা ও বালিশের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এটিই ইসলামের শিক্ষা এবং সুস্থ রুচির পরিচায়ক।

২৩. মা-বাবার মাঝে খুব বেশি ঝগড়া হওয়া

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কখনো কখনো মনোমালিন্য হতেই পারে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ হলো, যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নেওয়া। এর মাধ্যমে সন্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পায়। সে শেখে যে, কখনো কারো সাথে ঝগড়া বা মতভেদ হলে তা জিইয়ে না রেখে দ্রুত মিটমাট করে নেওয়াই উত্তম।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে দেখা যায় এর ভিন্ন চিত্র। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া শুরু হলে তারা সন্তানের মানসিক অবস্থার দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না। এমনকি ঘটনা কখনো এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, সন্তান দেখতে পায় তার মা-বাবার মাঝে কোনো হৃদ্যতা নেই। বাবা মাকে মারধর করছেন অথবা মা বাবাকে গালমন্দ করছেন। তারা একে অপরের সাথে কখনো হাসিমুখে কথাও বলেন না। এ ধরনের বৈরী পরিবেশে সন্তান এক প্রকার মানসিক ট্রমা বা আঘাতের শিকার হয়। তার অবুঝ মনে যাকে দুর্বল বা মজলুম মনে হয়, তার প্রতি মমতা জাগে। আর অপরের প্রতি জন্ম নেয় তীব্র ঘৃণা। মা-বাবার পারস্পরিক এই কলহ শুধু সন্তানের মানসিক ক্ষতিই করে না; বরং ধীরে ধীরে তার মনেও ক্ষোভ, জুলুম ও অন্যায়ের আগুন উস্কে দেয়।

২৪. বাবা-মায়ের কথা ও কাজে মিল না থাকা

অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা সন্তানকে কোনো ভালো কাজের আদেশ করছেন কিংবা কোনো মন্দ কাজ করতে নিষেধ করছেন, কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেরাই সে অনুযায়ী আমল করছেন না। যেমন: সন্তানকে বলছেন, 'মিথ্যা বলা মহাপাপ, কখনো মিথ্যা বলবে না।' অথচ তারা নিজেরাই অহরহ অন্যের সাথে মিথ্যা বলছেন। সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছেন, 'কারো সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে না।' কিন্তু নিজেরাই সন্তানকে নতুন জামা কিনে দেওয়ার কথা বলে মাসের পর মাস ঘুরিয়ে নতুন অজুহাত দেখাতে থাকেন।

আবার হয়তো সন্তানকে বোঝাচ্ছেন, 'সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।' অথচ তারা নিজেরাই প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ আচরণ করছেন কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছেন।

পিতা-মাতার কথা ও কাজে এমন অমিল বা বৈপরীত্য 'প্যারেন্টিং' তথা সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক ভুল। তবে একথা বলার উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে, পিতা-মাতা নিজেরা যা পালন করতে পারছেন না, সে ভালো কাজের আদেশ সন্তানকে দিতে পারবেন না। কিংবা নিজেরা কোনো মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়লে সন্তানকে তা থেকে নিষেধ করতে পারবেন না। বরং উদ্দেশ্য হলো, সন্তানের উপকারের জন্য তাকে অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, বক্তার নিজের জীবনে আমল না থাকলে তার উপদেশ অন্যের ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলে না। ফলে পিতা-মাতা নিজেরা সংশোধিত না হয়ে সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা নিতান্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

২৫. ঘরের বুয়া বা কাজের লোক নির্বাচনে সতর্ক না হওয়া

সন্তানদের দেখাশোনার জন্য বা ঘরের কাজের জন্য লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে গৃহকর্মী নির্বাচনের সময় তাদের দ্বীনদারি এবং আখলাক-চরিত্রের দিকে একেবারেই নজর দেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবা ভেবেও দেখেন না যে, এই লোকটি কি আমার সন্তানকে উত্তম আচার-ব্যবহার শেখাবে, নাকি মন্দ ও অন্যায় কাজে অভ্যস্ত করে তুলবে?

এক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে দেখা যায়, গৃহকর্মীদের দ্বীনদারি ও চারিত্রিক অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক হয় না। আর যেহেতু শিশুরা তাদের সাথেই দিনের অনেকটা সময় কাটায়, ফলে শৈশবেই তারা কাজের লোকের মন্দ স্বভাব ও অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে ধনী ও বিত্তশালী পরিবারের একটি অংশ অমুসলিম ও বিধর্মী গৃহকর্মী বা আয়া রাখতে পছন্দ করেন। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। শিশুরা হয়তো তাদের কাছ থেকে বাহ্যিক কিছু আদব-কায়দা শিখে ফেলে। কিন্তু ধর্মীয় কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে কেবল নামেই মুসলমান থাকে। কিন্তু তার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা সেই বিধর্মী কর্মচারীর মতোই গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।

২৬. মেয়েদেরকে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে বাহিরে যেতে দেওয়া

কন্যাসন্তানের লালন-পালন ও যত্নের ক্ষেত্রে একটি বড় ভুল হলো, তাদেরকে গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে দেখা দেওয়া হারাম) পুরুষের সাথে বাইরে বের হওয়ার বা এদিক-সেদিক ঘুরতে যাওয়ার

অনুমতি দেওয়া। সৃষ্টিগতভাবেই নারীরা আকর্ষণীয়। তাছাড়া অল্পতেই তারা আবেগী হয়ে পড়ে এবং সহজেই তাদের প্রভাবিত করা যায়। তাই গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করলে অন্যরা তার মাধ্যমে ফিতনায় পতিত হতে পারে এবং সে নিজেও ফিতনার শিকার হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের স্বর্ণ-রুপা, টাকা-পয়সা বা মূল্যবান সম্পদ যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া কখনো অরক্ষিত অবস্থায় বাইরে নিয়ে যান না। তাহলে এসব জড় পদার্থের চেয়েও বহুগুণ দামি, এমনকি অতুলনীয় ও অমূল্য সম্পদ—নিজের মেয়েকে পরিপূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা না করে কীভাবে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে? এটি কি কোনো সুস্থ বিবেকের অধিকারী মা-বাবার কাজ হতে পারে?

২৭. মোবাইল ফোন ব্যবহারে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করা

বর্তমান সময়ে সন্তান বিপথগামী হওয়া এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল, মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত অপব্যবহার এবং এ বিষয়ে পিতা-মাতার চরম উদাসীনতা। অনেক বাবা ছোট বাচ্চার কোনো প্রয়োজন ছাড়াই কেবল তাদের আবদার মেটাতে হাতে মোবাইল তুলে দেন। আর যাদের প্রয়োজন, তাদের স্মার্টফোন দেওয়া তো এখন স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হল, মোবাইল কিনে দেওয়ার পর সন্তান তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করছে কি না, কিংবা কোনো অন্যায় ও অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করছে কি না—এ ব্যাপারে মা-বাবা কোনো তদারকি করেন না। সন্তান কার সাথে কথা বলছে, বা কারো সাথে দীর্ঘ সময়

ধরে ফোনালাপ করছে কি না, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনকি তারা সন্তানের মোবাইলে সেভ করা নম্বরগুলো চেক করা বা মেসেজ ও ইমেইল যাচাই করার প্রয়োজনও বোধ করেন না। সন্তানের মোবাইল ব্যবহারের বিষয়ে এমন অসতর্কতা নিঃসন্দেহে তাদের সঠিক লালন-পালনের পথে একটি মারাত্মক অন্তরায়।

২৮. সন্তান কোন ধরনের বই পড়ছে—এ ব্যাপারে অবহেলা করা

মানুষের চিন্তাশক্তি ও মননশীলতা বিকাশে বই পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কোনো বিজ্ঞ ও আদর্শ লেখকের উন্নতমানের বই যদি কেউ পড়ে, তবে তার মাঝে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশুদ্ধ চিন্তার উন্মেষ ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, কেউ যদি অশ্লীল চটি বই বা কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিন পড়ে, তবে তার মনের মধ্যে সেই নোংরা ও বৈরী মনোভাবই দানা বাঁধবে।

দুঃখজনকভাবে অনেক পিতা-মাতা এ বিষয়ের প্রতি খেয়ালই রাখেন না যে, তাদের সন্তানরা আসলে কী পড়ছে। বইটি কি তাদের জন্য উপকারী? এটি কি তাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক, নাকি তাদের চরিত্রের জন্য ক্ষতিকর? সন্তানের পাঠ্যাভ্যাস সম্পর্কে এ ধরনের অবহেলা তাদের নৈতিক ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

২৯. সন্তানকে অপমান করা ও মনোবল দুর্বল করে দেওয়া

শিশুদের যদি ছোটবেলা থেকে অপমান করা হয়, তবে তারা কখনো অন্যের দৃষ্টিতে সম্মানিত হতে পারে না। অনেক মা-বাবা আছেন, যারা সন্তানের মনোজগত বোঝার চেষ্টাই করেন না। বরং তাদের মনোবল বাড়ানোর পরিবর্তে বিভিন্নভাবে তাদের অপমান ও অপদস্থ

করতে থাকেন। এটি সন্তানের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বড় বাধা। যেমন—

এক. বাচ্চারা যদি কোনো মজলিসে বা বড়দের সামনে ভালো কথা বলে, তবে তাকে 'সাবাস' বা উৎসাহ দেওয়া উচিত। আর যদি অনুপযুক্ত বা বেয়াদবিমূলক কিছু বলে ফেলে, তবে তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত। কিন্তু এর পরিবর্তে তাকে ধমক দিয়ে সবার সামনে চুপ করিয়ে দিলে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা এবং সাবলীলভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

দুই. বাচ্চাদের কোনো ভুল হয়ে গেলে তাকে বুঝিয়ে শুধরে দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক মা-বাবা তা না করে তাদের গালমন্দ ও তিরস্কার করতে থাকেন। এরপর যদি কখনো তার বা অন্য কারো দ্বারা একই ভুল হয়, তখন তারা পুরনো ভুলের কথা টেনে এনে বারবার খোঁটা দিতে থাকেন। এই আচরণ শিশুর মনে অপমানবোধ ও অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে।

তিন. সন্তানকে অপমান ও অবজ্ঞা করার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি হলো, তার ভালো কাজের আগ্রহকে দমিয়ে দেওয়া। সন্তান হয়তো কোনো ভালো কাজ আগ্রহ নিয়ে করছে। যেমন—খুব গুরুত্ব দিয়ে নামাজ পড়া বা বিনয়ের সাথে হাত তুলে দোয়া করা।

এমতাবস্থায় তাকে উৎসাহ না দিয়ে যদি মা-বাবা ঠাট্টা করে বলেন, 'এটা এমন কী বিশেষ কাজ হলো? অমুক তো এর চেয়েও লম্বা লম্বা দোয়া করে!'—এ জাতীয় কথা সন্তানের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এগুলো শিশুদের ভালো কাজ থেকে বিমুখ করে। তাদের ভালো কাজের উদ্দীপনা নষ্ট করে দেয়।

৩০. সন্তানকে দায়িত্ববান বানানোর চেষ্টা না করা

অনেক মা-বাবা আছেন, যারা সন্তানকে কোনো দায়িত্ব দিতে চান

না এবং দায়িত্ব পালনের কৌশলও শেখান না। এর কারণ হতে পারে—তারা সন্তানকে অতিরিক্ত ভালোবাসেন এবং তাকে কোনো ঝামেলা বা পেরেশানিতে ফেলতে চান না। অথবা তারা সন্তানের ওপর ভরসা করতে পারেন না। আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াকে প্রয়োজনই মনে করেন না।

কারণ যাই হোক না কেন, সন্তানকে দায়িত্ব সচেতন না করা এবং কর্মপদ্ধতি না শেখানো তার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ বিষয়ে অবহেলা সন্তানের পরবর্তী জীবনে অনেক ভোগান্তি ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যখন সে বড় হবে এবং তার কাঁধে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব আসবে, তখন সে তা পালনের কোনো উপায় বা কৌশল জানা না থাকায় চরম বিপাকে পড়বে এবং ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হবে।

৩১. সন্তানের মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা না করা

প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা, তেমনি শিশুদের মন-মানসিকতা ও আচার-ব্যবহারও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনো শিশু জন্মগতভাবেই খুব নরম ও সহনশীল প্রকৃতির হয়, আবার কেউ হয়তো একটু রাগী ও বদমেজাজি হয়। কেউবা স্বভাবগতভাবে গম্ভীর থাকে, আবার কেউ হয় অত্যন্ত চঞ্চল ও চপলে।

দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ মা-বাবা সন্তানের এই ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থা বা মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টাই করেন না। ফলে স্বভাবের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সব সন্তানের সাথে একই ধরনের আচরণ করেন। অথচ শিশুদের স্বভাবের এই ভিন্নতার দাবি হলো, প্রত্যেকের সাথে তার মেজাজ ও স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করা।

উদাহরণস্বরূপ, একটি চঞ্চল বা দুরন্ত বাচ্চাকে যদি ছোটখাটো

কোনো ভুলের জন্য দু-চারটি থাপ্পড় দেওয়া হয়, তবে এতে তার মনের ওপর খুব একটা প্রভাব পড়ে না। কিন্তু অত্যন্ত নরম ও স্পর্শকাতর স্বভাবের কোনো শিশুকে যদি সামান্য ভুলের কারণে কড়া ভাষায় বকাঝকা করা হয়, তবে এই সামান্য শাসনই তার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তাই সন্তানের মানসিক অবস্থা বুঝতে না পারা অনেক ক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩২. সন্তানের বয়সের প্রতি লক্ষ্য না রাখা

সন্তান যত বড়ই হোক না কেন, পিতা-মাতার কাছে সে সর্বদা ছোটই থাকে। স্নেহের এই জায়গা থেকে বিষয়টি যদি শুধু পিতা-মাতার মনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন সন্তান বড় হওয়ার পরও মা-বাবা তার সাথে শিশুসুলভ আচরণ করতে থাকেন।

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যখন দেখে যে, বাইরের সমাজ তাকে বড় ও দায়িত্বশীল মনে করছে, অথচ ঘরে তার মা-বাবা তাকে এখনো দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো নিয়ন্ত্রণ করছেন, তখন সে মারাত্মক মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এর ফলে সন্তান একপ্রকার হীনমন্যতার শিকার হয়। সে তখন স্থির করতে পারে না যে, তার আচরণ ও চালচলন আসলে কেমন হওয়া উচিত।

মা-বাবার এই অপরিণামদর্শী আচরণের ফলে সন্তানের বয়স ও দৈহিক বাড়ন্তের সাথে সাথে তার মেধা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

৩৩. সন্তান লালন-পালনে ব্যর্থ লোকদের গাল-মন্দ করা

আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক আছে, যারা অন্যের একটু দুষ্টু

প্রকৃতির শিশুদের দেখলেই গালমন্দ করতে থাকেন। তারা শিশুটির খারাপ দিকগুলো নিয়ে সমালোচনা করেন। তার পিতা-মাতার ওপর অপবাদ দেন, তারা সন্তান লালন-পালনে অবহেলা করেছেন।

অথচ একজন মুমিনের কাজ হলো সমালোচনা না করা। এমন পরিস্থিতিতে উচিত ছিল—গালমন্দ না করে ওই সন্তানের জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত ও সংশোধন হওয়ার তাওফিক দান করেন। পাশাপাশি নিজের সন্তানের জন্যও দোয়া করা, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে এ জাতীয় মন্দ ও খারাপ স্বভাব থেকে হেফাজত করেন।

আমাদের সমাজের চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। যারা অন্যের সন্তান ও অভিভাবকদের নিয়ে উপহাস বা গালমন্দ করেন, আল্লাহর বিধানে অনেক সময় তারাই বিপদে পড়েন। দেখা যায়, তাদের এই বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তা ও সমালোচনার শাস্তিস্বরূপ তাদের নিজেদের সন্তানরাই একসময় পথভ্রষ্টতার শিকার হয় এবং জীবনযাপনের জন্য অবৈধ কোনো পন্থা বেছে নেয়।

৩৪. সন্তানকে দুনিয়াবী শিক্ষা না দেওয়া

মানবসমাজের উন্নতি ও টিকে থাকার জন্য সুশিক্ষা হল মেরুদণ্ড তুল্য। তাই পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও সর্বোচ্চ লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি অনেক পিতা-মাতা সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত অবহেলা করে যাচ্ছেন।

অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে কোনো ধরনের শিক্ষাই দেন না। বরং তাদেরকে অশিক্ষিত ও মূর্খ বানিয়ে রাখেন। এটি যে কত বড় ভুল, তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে সন্তান সারাজীবন অজ্ঞতার আঁধারে জীবন কাটাতে থাকে। জীবন পরিচালনার জন্য ন্যূনতম

জ্ঞান না থাকায় দ্বীন ও দুনিয়া—উভয় ক্ষেত্রেই সে জীবনভর অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

৩৫. সন্তানকে দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞ রাখা

অনেক মা-বাবা আছেন যারা সন্তানের শিক্ষা নিয়ে খুব সচেতন। কিন্তু তাদের সব চিন্তা-ভাবনা ও দৌড়ঝাঁপ কেবল পার্থিব শিক্ষা নিয়ে, যার মাধ্যমে সন্তান দুনিয়ায় কিছু টাকা-পয়সা বা অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে পারবে। অথচ তারা সন্তানকে এতটুকু পরিমাণ দ্বীনী বিষয় শেখানোর প্রয়োজনও অনুভব করেন না, যার মাধ্যমে সে অন্তত তার স্রষ্টা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে।

একজন মুসলিম সন্তানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো—নামাজ, রোজা ও পবিত্রতার প্রাথমিক নিয়ম-কানুন জানা। প্রতিদিন চলার পথে যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, তার মাঝে হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে পারা। কুরআন কারীম দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে শেখা। নামাজ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা ও দৈনন্দিন জীবনের দরকারি দোয়া-দরুদ মুখস্ত রাখা।

সন্তানদের এই ন্যূনতম দ্বীনী শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার ওপর ফরজ এবং আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবার অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে সন্তানের মাঝে নিজ ধর্মের প্রতি সম্মান ও দ্বীনী বিষয় জানার আগ্রহ তৈরি হয় না। এমনকি তাদের মাঝে ফরজ-ওয়াজিব আমলগুলো আদায়ের গুরুত্বও অনুভূত হয় না। ফলে তারা পরকালে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে থাকে। আর পার্থিব জীবনেও তারা আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ভ্রষ্টতার পথে চলতে থাকে।

৩৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল বা মাদরাসা) নির্বাচনে অবহেলা করা

পারিবারিক পরিবেশের পর শিশুরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ স্কুল বা মাদরাসার পরিবেশ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাবই তার মাঝে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ পিতা-মাতা নিজ সন্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায়ই ভুল ও অবহেলা করে থাকেন। এই ভুলগুলো সাধারণত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে—

প্রথমত, মা-বাবা সন্তানের জন্য এমন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করেন যেখানে ধর্মীয় পরিবেশের ছিটেফোঁটাও থাকে না। সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষকগণ হয়তো ভিন্নমতাবলম্বী অথবা বিধর্মী হন, যার প্রভাব কোমলমতি শিশুদের ওপর পড়ে।

দ্বিতীয়ত, কিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, আইন-কানুন এবং পাঠদান পদ্ধতি এমন হয় যে, সেখানে কিছুদিন পড়াশোনা করলে সন্তানরা কেবল নামেই মুসলমান থাকে। চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা ভ্রান্ত ও বিধর্মীদের স্বভাব লালন করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা নিজেদের সবচেয়ে দামি সম্পদ 'ঈমান' হারিয়ে ফেলে।

তৃতীয়ত, বর্তমানে অধিকাংশ মা-বাবাই তাদের সন্তানকে এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান যেখানে 'সহশিক্ষা' চালু আছে। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে তারা উপযুক্ত সময়ের আগেই অনেক আপত্তিকর ও অনুপযোগী বিষয় সম্পর্কে জেনে যায়। এর ফলাফল প্রকাশ পায় তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে।

সমাজে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা বাড়ার এটি অন্যতম কারণ। পর্দা রক্ষা করা, সতীত্ব বজায় রাখা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব

তাদের অন্তর থেকে মুছে যায়। যা তাদের ইহকালীন ও পরকালীন ধ্বংস ডেকে আনে।

চতুর্থত, অনেকে আবার সন্তানকে যাচাই-বাছাই ছাড়া এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান, যেখানে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশই নেই। ফলস্বরূপ সন্তানের বছরের পর বছর নষ্ট হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অথবা এমন প্রতিষ্ঠানে দেন যেখানে পাঠদান পদ্ধতি উন্নত নয়। ফলে শিশুরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে বেয়াদব ও দুষ্ট হয়ে ওঠে। পড়াশোনার নামে এ ধরনের শিক্ষা তার জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই বয়ে আনে।

৩৭. বাড়ির কাজে সন্তানের সহায়তা না করা

অনেক মা-বাবা মনে করেন, সন্তানকে নামী-দামি কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেওয়া পর্যন্তই তাদের দায়িত্ব শেষ। সন্তান স্কুল বা মাদরাসায় গেল কি না, কিংবা বাড়িতে ফিরে শিক্ষকের দেওয়া কাজগুলো (হোমওয়ার্ক) ঠিকমতো করল কি না—এ ব্যাপারে তারা কোনো খোঁজখবর নেন না। এমনকি এসব কাজে সন্তানকে কোনো প্রকার সহযোগিতাও করেন না।

কখনো কখনো শিক্ষকরা যদি অভিভাবককে তার সন্তানের বিশেষ কোনো দুর্বলতার দিকে নজর দিতে বলেন, সেদিকেও তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না।

মনে রাখা দরকার, শিক্ষা হলো শিক্ষক ও অভিভাবকের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। মা-বাবার উদাসীনতার কারণে স্কুল বা মাদরাসার শিক্ষকরা অত্যন্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ওই সন্তান শিক্ষাজীবনে বরাবরই ব্যর্থ থেকে যায়। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য কখনোই তাদের হাতে ধরা দেয় না।

৩৮. সন্তানের উপস্থিতিতে শিক্ষকের বিরোধিতা করা

সন্তানের কোনো শিক্ষক অথবা কোনো মুরব্বি যদি কখনো সন্তানকে শাসন করেন, আর সন্তান সেই নালিশ নিয়ে পিতা-মাতার কাছে আসে, তখন মা-বাবার খুব সতর্ক থাকা উচিত। এ অবস্থায় মা-বাবার দায়িত্ব হলো, উত্তেজিত না হয়ে ওই শিক্ষক বা মুরব্বির কাছে গিয়ে নম্রতার সাথে জিজ্ঞেস করা যে, কোন ভুলের কারণে তাকে শাসন করা হয়েছে। এতে করে পিতা-মাতা সন্তানের সেই ভুলটি সংশোধন করার সুযোগ পান।

কিন্তু কোনোভাবেই সন্তানের সামনে শিক্ষকের সমালোচনা করা বা সন্তানের পক্ষ নিয়ে শিক্ষককে দোষারোপ করা উচিত নয়। যদি মা-বাবা সন্তানের সামনেই শিক্ষকের ভুল ধরেন বা তাকে গালমন্দ করেন, তবে সন্তানের অন্তর থেকে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে যায়। এর ফলে সন্তান নিজের ভুলের ওপর অটল থাকে, বেয়াদব হয় এবং ভবিষ্যতে খারাপ সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ সে জানে, সে যা-ই করুক না কেন, তার মা-বাবা অন্ধের মতো তার পক্ষই নেবেন।

সম্মানিত অভিভাবকগণ!

ওপরে আলোচিত বিষয়গুলো হলো আমাদের সমাজে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মা-বাবা থেকে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হওয়া কিছু বড় বড় ত্রুটি-বিচ্যুতি। এখন আপনারাই বলুন, এ ধরনের মারাত্মক ভুল ও অবহেলা নিয়ে সন্তানকে সঠিক ও যথাযথভাবে লালন-পালন করা কি আদৌ সম্ভব? তাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলা কি সম্ভব?

উত্তর হলো—কখনোই নয়। সন্তান প্রতিপালনে এসব মারাত্মক ত্রুটি

জিইয়ে রেখে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করা আর গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে ফলের আশা করা একই কথা। তাই আমাদের উচিত, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এসব ভুলত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজেদের সংশোধন করে সন্তানদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের **৬৫টি টিপস**

প্রাককথন : ইসলাম ও সন্তানের লালন পালন

ইসলামে সন্তানের তরবিয়তের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এর কিছু মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা লুকমানে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম নিজ সন্তানকে ঈমান-আকিদা ও আখলাক বিষয়ক কিছু উপদেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি হাদীসে নববীতেও সন্তানের তরবিয়ত সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন কারীম এবং হাদীসে নববীতে সন্তান প্রতিপালনের নির্দেশনামূলক যেসব বাণী উল্লেখ করা হয়েছে, তার আলোকে আমরা এ সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, সন্তানদের তরবিয়ত ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এ মূলনীতিগুলো সামনে রাখলে ইনশাআল্লাহ অভিভাবক এবং সন্তান সবাই উপকৃত হবেন। উভয়ই ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হবেন।

১. বিবাহের জন্য দ্বীনদার পাত্রী নির্বাচন করা

মায়েদের সাথে সন্তানের সম্পর্ক থাকে অনেক গভীর। মায়ের আচার-আচরণ, চলাফেরা শিশুদের অনেক বেশি প্রভাবিত করে। তাই সন্তানদের উত্তম তরবিয়তের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে, বিবাহের পাত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া। অন্যান্য গুণাবলির পাশাপাশি দ্বীনদারি এবং উত্তম আখলাক-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের দিকটাও লক্ষ্য রাখা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،
فاظفر بذات الدين؛ تربت يداك

অর্থ : চার কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। যথা:
১. ধনাঢ্যতা। ২. বংশ পরিচয়। ৩. সৌন্দর্য। ৪. দ্বীনদারি।
তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও, অন্যথায় তোমার হাত হোক ধুলোমলিন (অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও)।[13]

সন্তানের জীবনে মায়ের প্রভাব সবচেয়ে গভীর ও সুদূরপ্রসারী। মা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষালয়। তাই মা যদি দ্বীনদারি, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে তার সেই মহান গুণাবলির প্রতিফলন যেন সন্তানের মাঝেও ঘটে, সেদিকে সচেষ্ট থাকা উচিত।

কারণ, একজন পুণ্যবতী ও সচ্চরিত্রবান মায়ের নেক আমল ও ভালো গুণগুলোর প্রভাব কেবল সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তার ছোঁয়ায় পরিবারের অন্য সদস্যরাও ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। তারাও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠে। পারিবারিক এই পবিত্র পরিবেশ ও মায়ের সচ্চরিত্রতা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ,

13 সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫০৯০

মানসিক উন্নতি এবং জাগতিক ও পরকালীন অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

২. নেক সন্তানের জন্য দোয়া করা

মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সন্তান লাভ করা এক বিশেষ অনুগ্রহ। আর সেই সন্তান যদি নেককার হয় এবং দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করে, তবে তা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল নেয়ামত বা উপহারস্বরূপ।

যেহেতু হেদায়েত ও সফলতা একমাত্র আল্লাহর হাতে, তাই সন্তানের নেক বা সৎ হওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা উচিত। এটি কেবল সাধারণ কোনো আমল নয়। বরং নেক সন্তানের জন্য দোয়া করা নবী-রাসূল আ. ও আল্লাহ তাআলার প্রিয় নেককার বান্দাদের চিরায়ত অভ্যাস ও সুন্নত।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন কারীমে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর সেই আকুতি ও দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বার্ধক্যে পৌঁছেও আল্লাহ তাআলার কাছে নেক সন্তানের জন্য এভাবে ফরিয়াদ করেছিলেন—

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থ : সেখানে যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক দোয়া শ্রবণকারী। [14]

14 সূরা আলে ইমরান : ৩৮

কুরআন কারীমে সৎলোকদের গুণাবলীর ক্ষেত্রেও এই দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারাও আল্লাহ তাআলার কাছে এ বলে দোয়া করেছেন-

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ : আর যারা (প্রার্থনা করে) বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন জীবনসঙ্গী ও সন্তানাদি দান করুন যারা হবে চোখের শীতলতা, আর আমাদেরকে বানান মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ। [15]

৩. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আনন্দ প্রকাশ করা

সন্তান মহান রবের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ উপহার। একজন প্রকৃত মুমিনের মানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য তো এমনই যে, আল্লাহ তাআলা যখনই তাকে কোনো নেয়ামত দান করেন -তা ছোট হোক বা বড়- সে কায়মনোবাক্যে রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে। আল্লাহর ফয়সালার ওপর সে সর্বদা সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা কাউকে ছেলে সন্তান দান করুন কিংবা মেয়ে সন্তান, সর্বাবস্থায় তার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আনন্দ প্রকাশ করা। অন্তরে এমন আশঙ্কা বা ভয় যেন কখনোই স্থান না পায় যে, এই নতুন মেহমানের খাবার-দাবার ও অন্যান্য প্রয়োজন কে পূরণ করবে? বা সংসার কীভাবে চলবে?

কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে—যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আহার দিচ্ছেন, তিনিই দুনিয়ায় আগত প্রতিটি শিশুর রিজিক ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ের দিকে

15 সূরা ফুরকান : ৭৪

ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন—

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

অর্থ : আমি তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদেরকে) এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করি। [16]

আইয়ামে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগে মানুষের স্বভাব ছিল, কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তারা অসন্তুষ্ট হতো এবং একে লজ্জার বিষয় মনে করত। একজন মুমিনের আচরণ কখনোই তাদের মতো হতে পারে না। বরং কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ শুনলে বিন্দুমাত্র মন খারাপ করবে না। বরং একে পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করবে।

কারণ ইসলামে কন্যাসন্তান লালন-পালন এবং তাদের উত্তম তরবিয়ত বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যাসন্তানের উত্তম লালন-পালনকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাই আল্লাহর দান হিসেবে সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে—উভয় অবস্থাতেই মহান রবের শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য। বান্দা যখন সন্তুষ্টচিত্তে শুকরিয়া আদায় করে, তখন আল্লাহ তাআলা ওই সন্তানের হায়াত ও রিজিকে বরকত দান করেন। তাছাড়া মা-বাবা যখন সন্তানের আগমনে আনন্দিত হন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা সন্তানের যত্ন ও লালন-পালনে অনেক বেশি আন্তরিক হন। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হলে বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে

16 সূরা বনী ইসরাইল : ৩১

সন্তানের প্রতি অবহেলা চলে আসে। ফলে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত থেকেও তারা বঞ্চিত হন।

৪. উত্তম তরবিয়তের জন্য রবের কাছে সাহায্য চাওয়া

কোনো কাজই আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কখনো হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ সকল কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন। শিখিয়েছেন, আমরা যেন তারই পবিত্র সত্তার সাহায্য কামনা করি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[17]

তাই পিতা-মাতার উচিত, সন্তানদের উত্তম তরবিয়তের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য চাওয়া।

৫. সন্তানদের জন্য দোয়া করা

মুমিনের জন্য দোয়া হলো এক মজবুত হাতিয়ার। মহান রবের রহমত লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাই পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব হলো, সর্বদা সন্তানের কল্যাণ, সুস্থতা ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা।

আল্লাহর অনুগ্রহে সন্তান যদি নেককার ও সৎ হয়, তবে তার জন্য দোয়া করতে হবে, আল্লাহ যেন তাকে এই ভালো কাজের ওপর আজীবন অটল ও অবিচল রাখেন। আর আল্লাহ না করুন, সন্তান

17 সূরা ফাতেহা : ৪

যদি পথভ্রষ্ট বা মন্দ স্বভাবের হয়ে থাকে, তবে তার জন্য হেদায়েত ও সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য রবের কাছে ফরিয়াদ করতে হবে।

কিন্তু খবরদার! রাগের মাথায় সন্তানের জন্য বদদোয়া বা অভিশাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে শত বার চিন্তা করা উচিত। কারণ সন্তানের ব্যাপারে বদদোয়া করা হলে সে সংশোধিত হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। দুনিয়াতে তো তার অপকর্মের কারণে মা-বাবাকে সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবেই। উপরন্তু সন্তানের এই নৈতিক ও ধর্মীয় পদস্খলনের দায়ভার মা-বাবাকেও বহন করতে হতে পারে। ফলে আখেরাতের কঠিন আজাব ও পাকড়াও থেকেও তারা রেহাই পাবেন না।

৬. সন্তানের সুন্দর নাম রাখা

সন্তানের প্রতি মা-বাবার প্রথম ও অন্যতম কর্তব্য হলো, ইসলাম ও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দনীয় কোনো সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা। এমন কোনো নাম রাখা উচিত নয়, যা শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বা যার অর্থ মন্দ। কারণ সন্তানের নামের প্রভাব তার গোটা জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে।

হাদীস ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, মানুষের নাম কেবল তার বাহ্যিক পরিচিতিই নয়। বরং তার কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ এবং ব্যক্তিত্বের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। এমনকি এই প্রভাব তার পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও বিস্তার লাভ করতে পারে। মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকেও এ কথারই বাস্তবতা প্রমাণিত হয়।

সুতরাং, সন্তানের জন্য অপছন্দনীয় বা অসুন্দর নাম নির্বাচন করা একটি মারাত্মক ভুল। মা-বাবা সন্তানের জন্য যে নামটি নির্বাচন

করেন, বাহ্যিকভাবে তারা মূলত এটাই চান যে—ওই নামের গুণাবলি ও প্রভাব সন্তানের মাঝে প্রতিফলিত হোক।

ফলে সন্তানের সুন্দর নাম রাখার অর্থ দাঁড়ায়—মা-বাবা চাচ্ছেন সুন্দর নামটির ইতিবাচক গুণগুলো সন্তানের চরিত্রে ফুটে উঠুক। পক্ষান্তরে, অসুন্দর নাম রাখার অর্থ হলো—তারা যেন অজান্তেই চাচ্ছেন, ওই নামের মন্দ ও নেতিবাচক দিকগুলো সন্তানের মাঝে পাওয়া যাক! এখন মা-বাবাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা সন্তানের জন্য কোনটি বেছে নেবেন—কল্যাণ নাকি অকল্যাণ!

৭. ঈমান ও আকিদাগত বিষয়াবলি সন্তানের বুকে ধারণ করানো

পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদি দায়িত্ব হলো, শৈশব থেকেই সন্তানের কোমল হৃদয়ে স্বচ্ছ ঈমানের বীজ বপন করা এবং সেই চারাটিকে যত্ন সহকারে বড় করে তোলা। সঠিক পরিচর্যা পেলে ঈমানের এই ছোট্ট চারাটিই একদিন বিশাল ও মজবুত এক বৃক্ষে রূপ নেবে।

সন্তান যখন কথা বলতে শিখবে, তখন থেকেই তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা ও কালিমায়ে শাহাদাত শেখানো উচিত। এরপর যখন তার মাঝে সামান্য বুঝ তৈরি হবে, তখন মা-বাবা তার মনে মহান আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাআলা তাকে চোখ, কান, হাত-পা, বুঝ-বুদ্ধিসহ যেসব নেয়ামত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিনিয়ত যেসব অনুগ্রহ করছেন—সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন।

একইভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান, মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাকে অবগত করাবেন। তাঁর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করবেন। এভাবে ধাপে ধাপে বয়স ও বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে

তাকে ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে।

৮. শিশুদেরকে নৈতিক গুণাবলিতে আলোকিত করা

বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করা যে, তারা সন্তানদের শুরু থেকেই উন্নত ও প্রশংসনীয় নৈতিক গুণাবলির দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলবেন। তাদের লক্ষ্য হবে, সন্তানকে এমনভাবে তৈরি করা, যেন তারা দ্বীনদারি, খোদাভীতি, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের সৌন্দর্যে সুসজ্জিত হতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে তারা যেন নেক আমল, সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। সন্তানকে শেখাতে হবে—বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে তারা যেন ধৈর্য ধারণ করে। সুখ-শান্তির সময় যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। সাধারণ মানুষের সঙ্গেও যেন সদ্ব্যবহার করে। এসব শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দিতে হবে।

ভালো কিছু শেখা এবং অন্যকে শেখানো যেন তাদের প্রিয় ব্যস্ততা হয়ে ওঠে—সেভাবেই তাদের গড়ে তুলতে হবে। এতে করে তারা বড় হয়ে জাতির সামনে মানবতা, ভদ্রতা এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারবে।

৯. সন্তানদের খারাপ চরিত্র থেকে রক্ষা করা

সন্তানকে সৎ গুণাবলি শেখানোর পাশাপাশি সব ধরনের চারিত্রিক দোষ ও বদ-অভ্যাস থেকে বাঁচিয়ে রাখা মা-বাবার একান্ত কর্তব্য।

শুধু নিষেধ করাই যথেষ্ট নয়। বরং তাদের মনে এসব বদ-অভ্যাসের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি করে দিতে হবে।

যেসব দোষ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, হিংসা করা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, পরনিন্দা ও চোগলখোরি করা, অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, বড়দের অসম্মান করা এবং স্বার্থপরতা ইত্যাদি। শৈশব থেকেই এসব আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতে তা বিশাল জঞ্জালে পরিণত হবে।

১০. ইসলামী শিষ্টাচার শেখানো এবং অভ্যাসে পরিণত করা

ইসলাম কেবল কিছু ইবাদতের নাম নয়। বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপে ছোট ছোট বিভিন্ন আদব শিখিয়েছে। শিষ্টাচার গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছে।

যেমন—কোনো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে তাকে আগে সালাম দেওয়া। কেউ সালাম দিলে তার সুন্দর জবাব দেওয়া। কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। খাওয়ার সময় ডান হাতে খাবার খাওয়া। নাক-কান পরিষ্কার বা শৌচকার্যের মতো কাজে বাম হাত ব্যবহার করা। বাড়িতে কোনো মেহমান আসলে তাকে আনন্দচিত্তে অভ্যর্থনা জানানো। ওয়াশরুমে যাওয়া-আসার দোয়া ও নিয়ম মানা। অনর্থক কথাবার্তা বলা ও শোনা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

প্রত্যেক মা-বাবার উচিত, এই আদবগুলো সন্তানদের হাতে-কলমে শেখানো। এগুলোর ব্যাপারে বার বার তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা। শিশুরা ভুলে গেলে বা ভুল করলে

স্নেহের সাথে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এভাবে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে এই সুন্দর আচরণগুলো যেন তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয় এবং তাদের হৃদয়ের গহীনে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়—সে চেষ্টাই মা-বাবাকে করতে হবে।

১১. শিশুদের সাথে ভালো কথা বলা

পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো, সন্তানদের সাথে সর্বদা মার্জিত, সুন্দর ও কোমল ভাষায় কথা বলা। তাদের সাথে কথোপকথনের সময় অশোভনীয় শব্দ, কুরুচিপূর্ণ বাক্য কিংবা গালিগালাজ যেন কোনোভাবেই মুখ দিয়ে বের না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা যা শোনে, তাই শেখে।

সন্তান যদি কখনো কোনো ভুল করে ফেলে বা অন্যায় আচরণ করে, তবে রাগের মাথায় তাকে গালি দেওয়া যাবে না। কর্কশ কথা বলা যাবে না। সুন্দর ভাষায় সংশোধন করতে হবে।

তাকে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে— 'বাবা! এই কাজটি করো না। কারণ এটি খুব খারাপ কাজ, আল্লাহ এটি পছন্দ করেন না।' কিংবা স্নেহের সুরে বলা যেতে পারে, 'তুমি এখনই এই মন্দ কাজটি ছেড়ে দাও, এতে তুমি ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত হবে।'

এভাবে বুঝিয়ে বললে তাদের শিশুমনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তারা সহজেই নিজেদের শুধরে নিতে পারে।

১২. বিভিন্ন অবস্থার যিকির ও দোয়া শেখানো

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ঘটনা বা সংবাদের মুখোমুখি হই। এর মধ্যে কিছু সংবাদ বিস্ময়কর, কিছু সংবাদ দুঃখজনক, আবার কিছু আনন্দদায়ক। ইসলাম আমাদেরকে

জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান রবের স্মরণ বা যিকির করার জন্য সুন্দর ও অর্থবোধক কিছু সংক্ষিপ্ত দোয়া ও শব্দমালা শিখিয়েছে।

যেমন—বিস্ময়কর বা সুন্দর কিছু দেখলে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'মাশাআল্লাহ' বলা। দুঃখজনক কোনো সংবাদ শুনলে বা কোনো বিপদ দেখলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' বলা। কেউ কোনো উপকার বা ভালো কাজ করলে তাকে ধন্যবাদ জানাতে 'জাযাকাল্লাহ' বা 'বারাকাল্লাহ' বলা।

কথা বলার সময় ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই বরকতময় শব্দগুলো ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। সন্তানদেরও এই শব্দগুলো এবং এর সঠিক ব্যবহার শেখানো জরুরি। এতে করে তারা ছোটবেলা থেকেই ইসলামী শিষ্টাচার ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করার গুণ অর্জন করবে।

১৩. সন্তানকে কুরআন কারীম মুখস্থ করানো

সন্তানকে পবিত্র কুরআন কারীম মুখস্থ করানো বা শিক্ষা দেওয়া কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়। বরং এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, শৈশব থেকেই সন্তানদের কুরআন কারীম মুখস্থ করানোর চেষ্টা করা। বয়স ও মেধা অনুযায়ী শৈশবকাল অতিক্রম করার আগেই যেন তারা কুরআনের নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়াত বা সূরা মুখস্থ করে নিতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

যদি সন্তানের মেধা ও আগ্রহ দেখে এমন সম্ভাবনা পাওয়া যায় যে, সে পুরো কুরআন কারীম হিফজ (মুখস্থ) করতে পারবে, তবে অবশ্যই তাকে হাফেজ বানানোর চেষ্টা করা উচিত। কারণ পবিত্র কুরআন হিফজ করা সন্তানের নিজের জন্য যেমন দুনিয়া ও

আখেরাতে চরম ফযীলত ও সম্মান বয়ে আনে, ঠিক তেমনি তার পিতা-মাতার জন্যও এটি পরকালে মাগফিরাত এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার কারণ হবে। হাদীসে এসেছে, হাফেজের পিতা-মাতাকে হাশরের ময়দানে নূরের টুপি বা মুকুট পরানো হবে।[18]

আর যদি মনে হয় যে, সন্তানের পক্ষে পুরো কুরআন হিফজ করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো—অন্তত নামাজ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সূরা তাকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তত বিশুদ্ধভাবে কুরআন কারীম নাজেরা বা দেখে দেখে পড়া শেখাতে হবে। এটি পিতা-মাতার ওপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে, সন্তানের অন্য সব জাগতিক শিক্ষার আগে কুরআনের এই শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৪. দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করানো

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'দোয়া মুমিনের হাতিয়ার এবং দোয়া আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যম।'[19]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা দোয়া বা আমল শিখিয়েছেন। সেগুলো যথাসময়ে পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

যেমন—ঘুম থেকে ওঠার সময়, ঘুমাতে যাওয়ার সময়, মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময়, টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, খাবার গ্রহণ ও খাবারের পরের দোয়া ইত্যাদি।

---

18 সুনানে আবু দাউদ ১২৪১, মুসনাদে আহমাদ ১৫৬৪৫

19 মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং : ১৮২৯

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সকাল-সন্ধ্যার ও দৈনন্দিন কাজের এই মাসনূন দোয়াগুলো মুমিনকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ, ফিতনা-ফাসাদ, জিনের আছর এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অদৃশ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী।[20]

তাই বাবা-মায়ের উচিত, সন্তান ছোট থাকাবস্থায় তাদের সামনে শব্দ করে এই দোয়াগুলো প্রতিনিয়ত পড়া। এতে শিশুরা শুনে শুনে শিখবে। আর যখন তারা একটু বড় হবে এবং কথা বলতে শিখবে, তখন এই দোয়াগুলো অর্থসহ তাদের মুখস্থ করানোর চেষ্টা করা।

১৫. আমল বা কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা

একটি সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি হলো—'মানুষের ওপর কথার চেয়ে কাজের প্রভাব বেশি পড়ে।' অর্থাৎ উপদেশ দেওয়ার চেয়ে নিজে আমল করে দেখানোটা বেশি কার্যকরী। তাই বাবা-মায়ের উচিত, সন্তানকে কেবল মৌখিকভাবে ভালো হওয়ার উপদেশ না দিয়ে নিজেদের কাজের মাধ্যমে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

সন্তানকে সত্য বলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, আমানতদারিতা শিক্ষা দেওয়া, নামাজের গুরুত্ব বোঝানো, সময়ানুবর্তিতা ও সময়ের মূল্যায়ন শেখানো, অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখা—এসবই জরুরি। কিন্তু উপদেশ ও আমল যখন একসাথে হয়, তখন তা সন্তানের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই বাবা-মায়ের প্রধান করণীয় হলো, উল্লিখিত ভালো গুণাবলি আগে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা। এরপর তা দেখে যেন সন্তানরাও চর্চা করতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরি করা।

আর আপনার সন্তান যখন দেখবে আপনি তাকে সত্য বলতে বলছেন, কিন্তু নিজেই মিথ্যা বলছেন। তাকে আমানত রক্ষা করতে

20 আলমাকাসিদ লিযযারকানী, হাদীস নং : ৪৫৬

বলছেন, কিন্তু নিজেই মানুষের হক নষ্ট করছেন বা আমানতের খেয়ানত করছেন—তখন আপনার হাজারো ভালো উপদেশ তার কানে ঢুকবে না। প্রবাদ আছে—'অন্যকে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজে আমল করা কঠিন।'

পিতা-মাতার কথা ও কাজে মিল না থাকলে সন্তানের অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ কমে যায়। অনেক সন্তান তখন মনে মনে ভাবে, 'আমার বাবা-মা নিজেরাই তো নানান গুনাহ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত, তাহলে আমি কেন মানব?' সুতরাং সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে আগে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

১৬. সন্তানের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সন্তানের সাথে করা ওয়াদা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা। অনেক সময় বাবা-মা সন্তানকে কোনো ভালো কাজে উৎসাহিত করার জন্য বা কোনো বায়না থেকে বিরত রাখার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। যেমন বলেন, 'তুমি যদি এই কাজটি করতে পারো, তবে তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব' কিংবা 'তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব' ইত্যাদি।

বাবা-মায়ের উচিত, সন্তানদের দেওয়া এসব প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পূরণ করা। কারণ মা-বাবা যখন কথা রাখেন, তখন শিশুরাও শিখতে পারে যে, কাউকে কোনো কথা দিলে বা ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হয়। এই শিক্ষার ফলে আশা করা যায়, সন্তান ভবিষ্যতে সত্যবাদী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হিসেবে গড়ে উঠবে এবং জাতির জন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে, ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও সমাজে অহরহ দেখা যায়। সন্তান যখন জেদ ধরে বা বিরক্ত করে, তখন অনেক বাবা-মা তাদের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে সাময়িকভাবে রেহাই পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেন। তারা মনে মনে ভাবেন, 'এখন তো শান্ত হোক, পরে দেখা যাবে।' কিন্তু পরে আর সেই ওয়াদা পূরণ করা হয় না।

অভিভাবকের এমন আচরণ সন্তানের মনে মিথ্যা ও প্রতারণার বীজ বপন করে। তাদের মধ্যে খারাপ অভ্যাসের জন্ম দেয়। তাই বাবা-মায়ের উচিত, এ ধরনের গর্হিত কাজ ও মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া থেকে সর্বদা বিরত থাকা।

১৭. সন্তানদেরকে মন্দ জিনিস থেকে বাঁচানো

পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য হলো, সন্তানদেরকে সব ধরনের খারাপ, অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে রক্ষা করা। নিজের ঘরকে এমন সব উপকরণ থেকে পবিত্র রাখা, যা ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে।

ঘর যদি অশ্লীলতা বা পাপের উপকরণে পূর্ণ থাকে, তবে কোমলমতি শিশুদের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। তাই ঘরের পরিবেশ এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন সেখানে গুনাহের কোনো সুযোগ না থাকে। সন্তানরা সুস্থ ও পবিত্র মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

১৮. বাচ্চাদেরকে খেলাধুলার জন্য ভালো ও উপকারী সামগ্রী প্রদান করা

শিশুরা স্বভাবতই চঞ্চল এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হয়। এটি তাদের জন্মগত প্রবৃত্তি। তাই তাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ

রেখে বাবা-মায়ের উচিত, হালাল ও বৈধ খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান করা। যাতে তারা অবসর সময়ে তা দিয়ে খেলাধুলা করতে পারে এবং একঘেয়েমি থেকে মুক্ত থাকে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো—এমন খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, যা শিশুদের জন্য শুধু আনন্দদায়কই হবে না; বরং তা তাদের মানসিক বিকাশ ও শারীরিক গঠনেও সহায়তা করবে। যেমন—বুদ্ধিবৃত্তিক খেলা বা শরীরচর্চামূলক খেলা।

তবে মা-বাবাকে সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে, যেন ঘরে এমন কোনো খেলনা বা বিনোদনের বস্তু না প্রবেশ করে, যা শিশুদের চারিত্রিক মাধুর্য বিনষ্ট করে দেয় কিংবা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হয়।

১৯. কৈশোরে পদার্পণ ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান

ছেলে-মেয়েরা যখন বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরে পদার্পণ করে, তখন তাদের শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। এ সময় উপযুক্ত বই কিংবা কোনো সঠিক ও শালীন পন্থায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তন ও তৎসংশ্লিষ্ট শরয়ী মাসায়েল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া অভিভাবকদের দায়িত্ব। এতে করে তারা নিজের শরীর ও প্রজনন-ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো দেখে আতঙ্কিত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

তবে এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। যেন উপযুক্ত সময়ের আগে কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানানো না হয়। কারণ অপরিণত বয়সে অতিরিক্ত কৌতূহল তাদেরকে যৌন-বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে এবং বিপথগামী করতে পারে।

এজন্য পিতা-মাতার বিশেষ দায়িত্ব হলো, বয়ঃসন্ধিকালের এই নাযুক সময়ে সন্তানদেরকে সব ধরনের প্রেম-ভালোবাসার চটুল

গল্প-উপন্যাস, অশ্লীল ম্যাগাজিন এবং যৌনউত্তেজক বই পড়া থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা। পাশাপাশি গান-বাজনা, সিনেমা এবং অশ্লীল বিনোদন থেকেও তাদের দূরে রাখা। কারণ এসব বিষয় তাদের মনে অকালপক্কতা ও অবৈধ কামভাব জাগিয়ে তোলে, যা তাদের চরিত্র ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২০. সন্তানের পরিষ্কার-পরিছন্নতার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পরিষ্কার-পরিছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।[21]

তাই মা-বাবার উচিত, তারা তাদের সন্তানদের মাঝে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার অভ্যাস গড়ে তুলবেন। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তাদেরকে সচেতন করবেন।

২১. অতিরিক্ত সাজসজ্জা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-বাবার অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যেন সন্তানরা রূপচর্চা ও সাজসজ্জায় অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি না করে। বিশেষ করে পোশাক-পরিচ্ছদ, ফ্যাশন ও চালচলনে তারা যেন কাফের, ফাসিক কিংবা বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ না করে। কারণ বাহ্যিক বেশভূষা মানুষের মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

বিশেষত কন্যাসন্তানদের ব্যাপারে মা-বাবার সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরি। তারা যেন এমন পাতলা বা আঁটসাঁট পোশাক না পরে, যা

21. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২২৩

তাদের শরীরকে আবৃত করার পরিবর্তে শরীরের গঠন ও সৌন্দর্যকে আরও উন্মুক্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এ ধরনের পোশাক ও সাজসজ্জা কেবল তাদের শালীনতা ও লাজুকতাই নষ্ট করে না। বরং ধীরে ধীরে তাদের স্বভাব ও পবিত্র চরিত্রকেও বিকৃত করে ফেলে। তাই শৈশব থেকেই তাদের শালীন ও মার্জিত পোশাকে অভ্যস্ত করে তোলা আবশ্যক।

২২. কষ্ট সহ্য করা এবং পরিশ্রমে অভ্যস্ত করে তোলা

সন্তানকে অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে তোলা মা-বাবার জন্য মোটেও উচিত নয়। কারণ জীবন সবসময় এক গতিতে চলে না। তাই অনুকূল পরিস্থিতিতেই তাদের পরিশ্রমী হওয়া এবং কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা তৈরি করা দরকার।

শৈশব থেকেই যদি তারা কায়িক শ্রম ও ধৈর্যের অনুশীলন না করে, তবে ভবিষ্যতে জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মনে রাখতে হবে, পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে, অলসতা, আরামপ্রিয়তা ও শ্রমবিমুখতা মানুষকে কর্মক্ষমতাশূন্য করে দেয়। ফলে দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় জগতেই তাকে আফসোস ও হতাশার সাগরে ডুবতে হয়।

২৩. অতিরিক্ত কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম থেকে বিরত রাখা

সন্তানদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার জন্য তিনটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা মা-বাবার একান্ত কর্তব্য।

সেগুলো হলো—অহেতুক কথাবার্তা, অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া এবং মাত্রাতিরিক্ত ঘুম।

সন্তানদের অহেতুক ও নিরর্থক গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত রাখতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত ঘুম ও অনর্থক কথাবার্তাকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে, সে সময়ের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ তার হাতছাড়া হয়ে যায়।

একইভাবে অতিরিক্ত ভোজন বা পেট পুরে খাওয়ার অভ্যাস থেকেও তাদের দূরে রাখা উচিত। কারণ অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া মানুষের শরীরে অলসতা তৈরি করে। মনের মধ্যে উদাসীনতা ও 'গাফলাত' সৃষ্টি করে। এই উদাসীনতা ইবাদত-বন্দেগিতে অনীহা তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত এটি দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৪. নামাজের প্রতি আগ্রহী ও যত্নবান করে তোলা

সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন থেকেই তাকে নামাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। নামাযের অভ্যাস তার মাঝে গড়ে তুলতে হবে। এটি মা-বাবার ঈমানি দায়িত্ব।

এক্ষেত্রে পিতার কর্তব্য হলো, সাত বছর বয়সী ছেলেদেরকে নিজের সাথে নিয়মিত মসজিদে নিয়ে যাওয়া। জামাতের সাথে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। তবে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন তারা মসজিদে গিয়ে খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি বা চেঁচামেচি করে অন্য মুসল্লিদের নামাজের ব্যাঘাত না ঘটায়। এ বিষয়ে তাদের আদব ও শিষ্টাচার শেখাতে হবে।

তদ্রূপ মায়েদের কর্তব্য হলো, মেয়েদেরকে নিজের সাথে ঘরে নামাজ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা। ঘরে নামাজের পরিবেশ তৈরি করা।

এভাবে সাত থেকে দশ বছর পর্যন্ত তাদেরকে আদর ও উৎসাহ দিয়ে নামাজে অভ্যস্ত করতে হবে।

তবে সন্তানের বয়স যখন দশ বছর পূর্ণ হবে, তখন নামাজের ব্যাপারে আর কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। এ বয়সে নামাজের জন্য তাদের সাথে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে গুরুত্বের সাথে নিয়মিত নামাজ পড়ার আদেশ দিতে হবে। নামাজ ছেড়ে দিলে বা অবহেলা করলে যথাযথভাবে শাসন করতে হবে। সতর্ক করতে হবে। কারণ এটিই হলো সন্তানকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়ে তোলার মোক্ষম সময়। [22]

এতে করে তাদের উপর নামাজ ফরয হওয়ার আগেই তারা নামাযে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। ফলে প্রাপ্ত বয়স হবার পর নামায ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আল্লাহর নাফরমান বানাবে না।

২৫. সন্তানের ঝোঁক, প্রবণতা ও আগ্রহের বিষয় জানার চেষ্টা করা

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার একটি বড় দায়িত্ব হলো সন্তানের সার্বিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। তাদের খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের মনোযোগ ও আগ্রহ আসলে কোন বিষয়ের প্রতি? সে কি কোনো ভালো কাজের প্রতি ঝুঁকছে, নাকি মন্দ কোনো বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করছে? যদি সে কোনো মন্দ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তবে দ্রুত তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

পক্ষান্তরে, তার মনোযোগ যদি কোনো ভালো ও সৃজনশীল বিষয়ের প্রতি থাকে, তবে তার জন্য উপযোগী পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে দিতে হবে। এটি মা-

22 সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯৪, ৪৯৫

বাবার কর্তব্য। যাতে করে তার সেই ভালো ও ইতিবাচক কাজগুলো আরও উন্নতি লাভ করে। সেগুলো আলোর মুখ দেখতে পায়।

সন্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে মা-বাবার নিজস্ব চিন্তা ও পরিকল্পনা আগে থেকেই স্থির করে ফেলা এবং সেটিই তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এতে সন্তানের ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

তাই সন্তানের আগ্রহ ও ঝোঁক যদি লেখাপড়ার দিকে হয়, তবে তাকে উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ করে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা উচিত।

এখানেই শেষ নয়। পড়ালেখার ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যে, সে আসলে কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে চায় বা কোন বিষয়ে তার মেধা বেশি। এক্ষেত্রেও অভিভাবকের নিজস্ব মতামত বা অপূর্ণ স্বপ্ন তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

আর যদি পড়ালেখা তার আগ্রহের বিষয় না হয়, বরং অন্য কোনো কারিগরি কাজ, পেশা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে তার ঝোঁক থাকে, তবে তাকে জোর না করাই শ্রেয়। সেক্ষেত্রে মৌলিক কিছু শিক্ষা ও আদব-কায়দা শেখানোর পর তাকে সেই দিকেই যেতে দেওয়া উচিত। তার আগ্রহ ও মেধার বিপরীত অন্য কোনো জিনিসের প্রতি তাকে বাধ্য করা প্রকারান্তরে তার হক নষ্টের শামিল।

একটি কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে যে কাজের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তার মনোযোগ ও আকর্ষণ প্রাকৃতিকভাবেই সে বিষয়ের প্রতি থাকে। তাই ওই কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতে তাকে বাধ্য করা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। বরং এতে তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

২৬. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস জোগানো

পিতা-মাতার উচিত সন্তানের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর উপলব্ধি জাগিয়ে তোলা। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেওয়া, যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সৎ সাহসের সাথে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

পরিবারের কোনো বিষয়ে বা কোথাও নিজের মতামত প্রকাশের প্রয়োজন হলে সে যেন চিন্তা-ফিকির করে এবং বড়-ছোট সবার প্রতি সম্মান বজায় রেখে নির্ভয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে—সেই পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

অনেক সময় সন্তানকে 'অবুঝ' বা 'অপরিপক্ক' মনে করে তার মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মা-বাবার এই অবহেলার কারণে সন্তানের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। নিজের দৃষ্টিতেই নিজেকে সে তুচ্ছ মনে করতে শুরু করে। ফলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময়েও সে তার সঠিক মতামত প্রকাশ করার সাহস পায় না। এভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হওয়ায় জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হয়।

২৭. সন্তানের সাথে পরামর্শ করা

পারিবারিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্তানের সাথেও পরামর্শ করা উচিত। এতে তাদের মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যেমন ধরুন—বাড়িতে নতুন কোন রঙ ব্যবহার করা হবে, কোন মডেলের গাড়ি কেনা যায়, ঘরের আসবাবপত্র কীভাবে সাজানো হবে কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের দাওয়াত এলে সেখানে যাওয়া উচিত কি না—ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানের সাথে পরামর্শ করা ভালো।

এক্ষেত্রে পদ্ধতি হবে—প্রথমে সন্তানদের চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দেওয়া। তাদেরকে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে বলা। এরপর

তাদের মতামতের স্বপক্ষে কী যুক্তি বা কারণ আছে, তাও জিজ্ঞাসা করা। অতঃপর সবার মতামত সামনে এলে সেগুলোর ভালো-মন্দ দিকগুলো তাদের সামনে বিশ্লেষণ করা।

সন্তানদের সাথে পরামর্শ করার বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে কল্যাণকর। এর দ্বারা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তার গুরুত্ব কতটুকু, সেটা সে বুঝতে পারে। তার আত্মমর্যাদাবোধ বাড়ে। তার মধ্যে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস তৈরি হয়। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন দিক সামনে রাখা উচিত, তাও সে শিখতে পারে। শুধু তাই নয়, নিজের মনের কথা অন্যের সামনে গুছিয়ে উপস্থাপন করার যোগ্যতাও তার মধ্যে সৃষ্টি হয়।

২৮. কিছু কিছু দায়িত্ব সন্তানের ওপর অর্পণ করা

সন্তানকে দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার বয়স ও মেধার বিকাশের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কিছু কিছু দায়িত্ব তাকে দেওয়া উচিত। শুধু দায়িত্ব দিয়েই শেষ নয়। সে ওই দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করেছে কি না, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

যেমন—সন্তান যদি ছোট হয়, তবে খাবার খাওয়ার সময় দস্তরখান বিছানো, গ্লাস-প্লেট এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ছোটখাটো কাজের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। মেয়ে একটু বড় হলে রান্নাবান্নার কাজে মাকে সাহায্য করা অথবা ঘর গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব দেওয়া। আর ছেলে কিছুটা বড় হলে বাড়ির কাছের কোনো দোকান থেকে টুকটাক কিছু সদাই কেনা বা বিল পরিশোধের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

এভাবে সন্তান যখন আরও কিছুটা বড় হবে এবং তার বিচার-বুদ্ধি আরও বিকশিত হবে, তখন মাঝে-মধ্যে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে ঘরের প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু জিনিস তাকে স্বাধীনভাবে—নিজে

ভেবেচিন্তে কিনে আনতে বলা উচিত। এতে করে ভবিষ্যতে তার ওপর সংসার বা কর্মজীবনের কোনো বড় দায়িত্ব এলে, পূর্বের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের কারণে সে তা উত্তমরূপে পালন করতে পারবে।

২৯. সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের অভ্যাস তৈরি করা

পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, ছোটকাল থেকেই সন্তানকে দ্বীনী ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার প্রতি জোর তাকিদ দেওয়া এবং তাকে এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোলা। মানুষের উপকারে আসা মহৎ গুণের একটি।

সন্তান যেন তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী গরিব-মিসকীনদের সহযোগিতা করতে পারে, অভাবী ও পেরেশানগ্রস্ত লোকদের পাশে দাঁড়াতে পারে—সে শিক্ষা তাকে দিতে হবে। এছাড়া সামাজিক সেবামূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের বিভিন্ন ইতিবাচক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। এতে তার মন উদার হবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে।

৩০. সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা তৈরি করা

পারিবারিক জীবনে কখনো কখনো পিতা-মাতা এমন অবস্থার সম্মুখীন হন, যখন খুব দ্রুত চিন্তা-ভাবনা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বুঝমান ছেলে-মেয়েকে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

অভিভাবক তাদের বলবেন, 'বলো তো, এখন আমাদের কী করা উচিত?' এরপর খেয়াল রাখতে হবে, সে কী সিদ্ধান্ত নিল। যদি তার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়, তবে তাকে সাধুবাদ জানাবে ও প্রশংসা করবে। আর যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাকে বকাঝকা না করে অত্যন্ত নম্রতা ও মহব্বতের সাথে বিষয়টি বুঝিয়ে বলবে। ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু দিকনির্দেশনা দিয়ে দেবে। এই চর্চার ফলে তার মধ্যে ভবিষ্যতে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সাহস ও প্রজ্ঞা তৈরি হবে।

৩১. বয়সের প্রতি খেয়াল রেখে আচার-ব্যবহার করা

পিতা-মাতাকে মনে রাখতে হবে, সন্তান বয়সের সাথে সাথে বেড়ে উঠছে। সেই সাথে তার চিন্তাশক্তি ও ব্যক্তিত্বও বিকশিত হচ্ছে। তাই সর্বদাই তার বয়সের প্রতি লক্ষ রেখে তার সাথে সে অনুযায়ী সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে।

অনেকেই তাদের সন্তান বড় হওয়ার পরও তাদের সাথে এমন আচার-ব্যবহার করেন, যেন মনে হয় তাদের সন্তান এখনো সেই কোলের শিশুটিই রয়ে গেছে। এর দ্বারা সন্তানের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আর এমন শিশুসুলভ আচরণ যদি পরিবারের বাইরের কারো সামনে, বিশেষ করে তার সমবয়সীদের সামনে করা হয়, তবে সে মারাত্মক লজ্জায় পড়ে যায় এবং হীনমন্যতায় ভোগে। তাই সন্তানের বয়স ও ব্যক্তিত্বের দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি।

৩২. সন্তানদের সময় দেওয়া

পিতা-মাতা যতই ব্যস্ততার মধ্যে থাকুন না কেন, তাদের জন্য জরুরি হলো—সন্তানের জন্য দিনের অন্তত একটা সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া। সেই সময়টা তারা কেবল সন্তানের সাথেই কাটাবেন।

তখন মোবাইল বা অন্য কাজ দূরে রেখে তাদের সাথে খোশগল্প করবেন। তাদের মনের কথা শুনবেন। তাদের সান্ত্বনা দেবেন। তাদের কী প্রয়োজন, তাদের মনে কী পেরেশানি চলছে—তা জানার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি তাদেরকে নবী-রাসূল ও মনীষীদের বিভিন্ন উপকারী ও শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাবেন।

এক্ষেত্রে ব্যস্ততা বা সময় স্বল্পতার দোহাই দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটি পরীক্ষিত সত্য যে, যেসব পিতা-মাতা তাদের সন্তানের আশেপাশে থাকেন, তাদের সাথে সময় কাটান, তাদের ভালো-মন্দ বোঝান এবং তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করেন—তারা এর সুফল ভোগ করেন। তাদের সন্তানরা সর্বদা প্রফুল্ল ও খোশমেজাজে থাকে এবং মা-বাবার অনুগত হয়।

পক্ষান্তরে, যেসব পিতা-মাতার হাতে তাদের সন্তানকে দেওয়ার মতো সময় থাকে না, তারা কেবল টাকা-পয়সা দিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করেন—তাদের সন্তানের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন এবং কর্মজীবনের নানান জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার যোগ্যতা তৈরি হয় না। একসময় সে সরল ও সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায়।

এমনকি কখনো তো এমনও হয়, সন্তানরা তাদের পিতামাতা থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে প্রশান্তিটুকু তার নিজের ঘরে ও মা-বাবার কাছে প্রাপ্য ছিল, তা সে বাইরে খুঁজতে চেষ্টা করে। আর এই সুযোগে অসৎ সঙ্গীরা তাকে লুফে নেয় এবং স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়।

৩৩. সন্তানের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা

ইসলামী শরিয়ত প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রেই ন্যায় ও ইনসাফ বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা এবং ইহসানের আদেশ করেন। [23]

সুতরাং পিতা-মাতার জন্যও জরুরি হলো, সকল সন্তানের সাথে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা। একজনকে আরেকজনের ওপর অন্যায়ভাবে প্রাধান্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

লক্ষ রাখতে হবে, এই ন্যায়-ইনসাফ কেবল বস্তুগত বিষয় তথা টাকা-পয়সা ও পার্থিব ধন-সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং অবস্তুগত বিষয় তথা স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর-যত্নের ক্ষেত্রেও সমান আচরণ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই সমান। কোনোভাবেই লিঙ্গভেদে বৈষম্য করা যাবে না। বরং সবাইকে সমতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

৩৪. সন্তানের কাছে স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করা

পিতা-মাতার কাছে সন্তানের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা হলো স্নেহ ও ভালোবাসা। নিজেদের সন্তানের এই মানসিক চাহিদা পূরণের প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। শুধু মনে মনে ভালোবাসলেই চলবে না। বরং সন্তানের কাছে সেই স্নেহ ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশও করতে হবে। এতে সন্তান অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে। নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুখময় মনে করে বেড়ে ওঠে।

এর বিপরীত হলে, অর্থাৎ ভালোবাসা প্রকাশ না করলে সন্তান নিজেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত মনে করে। ফলে সে ঘরের বাইরে

23 সূরা নাহল : ৯০

অন্যের কাছে সেই ভালোবাসা ও মনোযোগ খুঁজতে থাকে। আর এটি অনেক সময় তার নৈতিক স্খলন ও বিপথগামী হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া মানসিক অতৃপ্তি তার চিন্তাশক্তির বিকাশেও বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৩৫. সন্তানদের জন্য খরচ করা

সন্তানের ভরণ-পোষণ ও তাদের প্রয়োজনে খরচ করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। তবে এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি—

প্রথমত, খরচের ক্ষেত্রে এতোটা কার্পণ্য করা উচিত নয় যে, সন্তানের মৌলিক প্রয়োজনই পূরণ হয় না এবং তাকে অভাবী বা দরিদ্রের মতো জীবন কাটাতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে সে বাধ্য হয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য চুরি বা অন্য কোনো অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আবার সন্তানকে এতটা সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যও দেখানো উচিত নয় যে, সে সীমাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে। তার যাবতীয় সব ধরনের বায়না ও শখ পূরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে—যাতে একদিকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো ভালোভাবে পূরণ হয়, আবার অন্যদিকে তার মধ্যে যেন বিলাসিতা ও অপচয়ের মন্দ অভ্যাস গড়ে না ওঠে।

৩৬. সন্তানের মধ্যে ত্যাগের স্পৃহা জাগ্রত করা

পিতা-মাতা সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলবেন, যেন তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভাই-বোনসহ অন্যকে প্রাধান্য

দেওয়ার (ইসার) মহৎ গুণ তৈরি হয়। তারা যেন অন্যের সুখ-দুঃখের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করে।

এভাবে শিক্ষা দিলে তারা ভবিষ্যতে স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক হবে না। সন্তানদের মধ্যে ত্যাগের এই অভ্যাস গড়ে তোলা গেলে ঘরের অভ্যন্তরীণ অনেক ঝগড়া-বিবাদ ও সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হয়ে যাবে। পরিবারে শান্তির সুবাতাস বইবে।

৩৭. সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা

শিশুরা যখন কোনো কথা বলতে চায়, তখন তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া কিংবা তার কথার গুরুত্ব না দেওয়া একেবারেই অনুচিত। বরং সন্তান কোনো কথা বললে—বিশেষ করে সে যদি ছোট হয়—তার কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত এবং তার প্রতি নিজেদের পূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত।

যেমন—তার দৃষ্টিতে কথার কোনো অংশ যদি আশ্চর্যজনক হয়, তবে নিজেদের চেহারাতেও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তোলা। কথার ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু ইশারা বা মন্তব্য করা, যাতে সে বুঝতে পারে যে তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে সে কোনো প্রশ্ন করলে তার যথার্থ ও বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেওয়া।

এমনটি করা হলে সন্তানের মধ্যে কয়েকটি ইতিবাচক গুণের বিকাশ ঘটবে। যেমন:

১. সুস্পষ্টভাষী হওয়া

২. মেধার বিকাশ ঘটা

৩. অন্যের কথা শোনার ও বোঝানোর যোগ্যতা অর্জন

৪. বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনা দক্ষতার উন্নতি

৫. পিতা-মাতার সাথে স্নেহ-ভালোবাসা ও নৈকট্য বৃদ্ধি পাওয়া।

৩৮. সন্তানের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা

সন্তানের দ্বীনী ও পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা মা-বাবার জন্য অত্যন্ত জরুরি। মা-বাবাকে সন্তানের ছোট-বড় সকল বিষয় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে তারা প্রধানত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। যথা:

১) সন্তান নামাজ, কুরআন তিলাওয়াতসহ অন্যান্য দ্বীনী আমলের প্রতি যত্নবান কি না?

২) বাসার কিংবা ব্যক্তিগত মোবাইলের অপব্যবহার করছে কি না?

৩) তার বন্ধু-বান্ধব কারা এবং তাদের আচার-ব্যবহার কেমন?

৪) বাড়ির বাইরে থেকে সে কোনো নতুন জিনিস নিয়ে আসছে কি না? আনলে তা কী এবং কোত্থেকে পেল?

৫) তাদের পকেট, আলমারি, ড্রয়ার, বুকশেলফ কিংবা বালিশের নিচে সন্দেহজনক কিছু লুকিয়ে রাখে কি না?

৬) সে কি কোনো কিছু অন্যদের চোখের আড়াল করতে চায়? কেন এমনটি করতে চায়?

৭) স্কুল-কলেজ বা কোচিংয়ে যাওয়ার নাম করে সে আসলে অন্য কোথাও যায় কিনা?

৮) সে কোন ধরনের বই পড়ে? তার কাছে এমন কোনো সাহিত্য বা ম্যাগাজিন আছে কি না, যা তার ঈমান, আকিদা ও চরিত্র নষ্ট করতে পারে?

সংক্ষেপে বললে, পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মা-বাবাকে অত্যন্ত কৌশলী হতে হবে। তারা নজরদারি করবেন অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। যাতে সন্তানের মনে এমন ধারণা না জন্মে যে, মা-বাবা তাকে বিশ্বাস করেন না বা সন্দেহ করছেন। অহেতুক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সন্তানকে 'অপরাধী' সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

৩৯. সন্তানের ভালো বন্ধুদের সম্মান ও স্নেহ করা

ছেলে-মেয়ের যদি ভালো ও সচ্চরিত্রবান বন্ধু থাকে, তবে মা-বাবার উচিত তাদের সম্মান করা। ছেলের বন্ধু বা মেয়ের বান্ধবী যখন বাসায় আসবে, তখন তাদের সাথে ভালো ও নম্র ব্যবহার করতে হবে। এই ভালো বন্ধুত্বের ব্যাপারে সন্তানকে উৎসাহ দিতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিয়ে বাসায় আনা এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

এক কথায়, নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়ার এবং খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বন্ধুদের অযথাই বঞ্চিত করা ঠিক নয়। পিতা-মাতার এই উদার আচরণের ফলে সন্তানের বন্ধু মহলে তাদের সম্মান বাড়বে এবং নিজেদের সন্তানের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। এর সুফলগুলো হলো:

১) নিজেদের ঘরে নিজেদের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুভব করবে, যা তাদের মানসিক প্রশান্তি দেবে।

২) মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে।

৩) ভালো মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখার আগ্রহ তৈরি হবে।

৪০. খারাপ বন্ধুদের প্রভাব থেকে বাঁচানো

সন্তানদের এমনভাবে দেখে-শুনে রাখা উচিত, যাতে তারা কোনোভাবেই খারাপ ছেলে-মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে না পারে। এরপরও যদি তারা খারাপ সঙ্গ গ্রহণ করে ফেলে, তবে অনতিবিলম্বে সেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।

শুরুতেই কঠোর হওয়া বা সন্তানদের সামনে তাদের বন্ধুদের গালমন্দ করা উচিত নয়। কারণ সন্তানরা হয়তো না বুঝেই তাদের ভালো মনে করে বন্ধুত্ব করেছে। তাই মা-বাবার কঠোর আচরণ তাদের মধ্যে ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে তারা সম্পর্ক আরও গভীর করতে পারে।

উত্তম পন্থা হলো—প্রথমে কোমলতা ও ভালোবাসার সাথে অসৎ সঙ্গের কুফল সম্পর্কে তাদের বোঝানো। যদি এতে কাজ না হয়, তবে ভয় দেখানো বা ধমক দেওয়া যেতে পারে। তাদের বোঝাতে হবে যে, মা-বাবা কেবল তাদের মঙ্গলের জন্যই এসব বলছেন।

এতেও কাজ না হলে প্রয়োজনে ওই খারাপ বন্ধুদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে সন্তানদের দূরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি কোনো পদ্ধতিতেই কাজ না হয়, তবে শেষ পর্যায়ে কঠোরতা অবলম্বন করা এবং সন্তানদের কড়া শাসনের মধ্যে রাখা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

৪১. অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করা

অনেক সময় এমন হয় যে, সন্তানের স্বভাববিরুদ্ধ কোনো অসংযত আচরণ হঠাৎই প্রকাশ পেয়ে যায়। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার উচিত তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখানো।

এই অবস্থায় মা-বাবা বিষয়টিকে সাময়িকভাবে এড়িয়ে যাবেন বা না দেখার ভান করবেন—যেন তারা কিছুই লক্ষ করেননি। তবে একেবারে অবহেলা করবেন না। বরং পরে ঠাণ্ডা মাথায় সন্তানের এই আচরণের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করবেন বা কৌশলে এ বিষয়ে কথা বলবেন। যাতে সন্তান বুঝতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকে।

৪২. যেকোনো ভুলকে বড় করে না দেখা

সন্তানের ভুলগুলোকে প্রাথমিকভাবে খুব বড় করে দেখা উচিত নয়। বরং ভুল ও অপরাধ যে মাত্রার, সেটাকে সেই পর্যায়েই রাখা উচিত এবং সে অনুযায়ী তাকে সতর্ক করা উচিত। ছোট ভুলকে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়।

সবসময় মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে এমন কোনো পরিবার নেই যার সদস্যরা ভুলের ঊর্ধ্বে। কম-বেশি ভুল সবারই হয়। তাই ভুলের মাত্রা বুঝে সহনশীলতার সাথে তা সংশোধন করতে হবে। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪৩. সন্তানদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সন্তান কোনো ভুল করলে তাকে সংশোধনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া। তাকে এতটুকু সময় ও সুযোগ দিতে হবে, যেন সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

সংশোধনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, প্রথমবারেই কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত নয়। সতর্ক করার সময় ভাষাও সংযত রাখা চাই।

একটি জঘন্য ব্যাপার হলো, অনেক সময় সন্তান কোনো ভুল করলে সেই ভুলটিকেই তার পরিচয় বা লকব বানিয়ে ফেলা হয়। যেমন—লুকিয়ে কিছু টাকা নিলে তাকে সারাজীবন 'চোর' বলে ডাকা। এটি একেবারেই বর্জনীয় ও ক্ষতিকর অভ্যাস।

৪৪. শাসন করা ও শাস্তি প্রদান

সন্তানদের সাথে মৌলিকভাবে নম্র ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করাই ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু তরবিয়তের স্বার্থে কখনো কখনো তাদের শাসন বা শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি—

১) প্রথম ভুলেই শাস্তি না দেওয়া। বরং আগে বোঝানো ও সতর্ক করা।

২) শাস্তি যেন কেবল সংশোধনের উদ্দেশ্যেই হয়। নিজের ব্যক্তিগত রাগ বা ক্ষোভ মেটানোর জন্য নয়। তাই প্রচণ্ড রাগের মাথায় শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৩) ছোট বাচ্চা, ভাই-বোন বা অন্য কারো সামনে শাস্তি না দেওয়া। কারণ এতে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ কমে যায়। নির্লজ্জতা তৈরি হয় এবং ভাই-বোনে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।

৪) প্রাথমিকভাবে মানসিক শাস্তির ওপর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। যেমন—প্রশংসা বন্ধ করে দেওয়া, সাময়িকভাবে কথা না বলা বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। অনেক সময় এতেই কাজ হয়ে যায়।

৫) মানসিক শাস্তিতে কাজ না হলে শারীরিক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাস্তির স্থান ও মাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। শাস্তি এমনভাবে দিতে হবে যেন সে ব্যথা পায়, কিন্তু শরীরের কোনো অঙ্গের ক্ষতি না হয়, হাড় না ভাঙে বা দাগ না পড়ে।

বিশেষ করে মুখমণ্ডল ও শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে আঘাত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه

অর্থ : তোমাদের কেউ যখন কাউকে প্রহার করে তখন চেহারায় প্রহার করা থেকে যেন বিরত থাকে। [24]

৪৫. কঠোরতার পাশাপাশি নম্র আচরণ করা

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো—শাসনের সময় কঠোরতা ও কোমলতার ভারসাম্য বজায় রাখা। সন্তানের কোনো ভুলের কারণে যদি বাবা-মায়ের যেকোনো একজন তাকে মৌখিকভাবে শাসন বা সতর্ক করেন, তবে অপরজনের উচিত সেই মুহূর্তে সন্তানের পক্ষ না নেওয়া। কারণ শাসনের সময় পক্ষ নিলে বা বাধা দিলে শাসনের গুরুত্ব হালকা হয়ে যায় এবং মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এতে সন্তানের মন থেকে শাসনের ভীতি ও অপরাধবোধ দূর হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, মা যদি সন্তানের কোনো অন্যায় কাজের জন্য তাকে শাসন করেন বা বকুনি দেন, তখন বাবার উচিত সেই মুহূর্তে সন্তানের পক্ষ অবলম্বন না করা। বরং তিনি অপেক্ষা করবেন। শাসন শেষ হওয়ার পর সন্তান যখন বকুনি খেয়ে একপাশে লুকিয়ে থাকে কিংবা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মন খারাপ করে বসে থাকে, তখন বাবা তাকে কাছে ডাকবেন এবং পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরবেন।

অতঃপর তার সাথে অত্যন্ত নম্র আচরণ করবেন এবং কোমল ভাষায় তাকে বোঝাবেন। বলবেন, 'দেখো বাবা! তোমার আম্মু তোমাকে

24 সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৬৬৫২

কতটা ভালোবাসেন। তবুও তিনি আজ তোমাকে শাসন করেছেন, কারণ তুমি যে কাজটি করেছ তা আসলে খুব খারাপ। তিনি তোমার মঙ্গলের জন্যই এমনটি করেছেন। তাই ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কাজ করো না।'

এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে সন্তানের মন থেকে অহেতুক ভয় ও আশঙ্কা দূর হবে। সে মানসিক প্রশান্তি পাবে। পাশাপাশি সে নিজের ভুলটিও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। ভবিষ্যতে সেই ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

৪৬. পিতা-মাতার পারস্পরিক সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকা

সন্তানের উত্তম লালন-পালন ও সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হলো—বাবা-মায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ও গভীর হওয়া। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যত্নবান, শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল হওয়া একান্ত জরুরি।

তাদের উচিত পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি হয়—এমন সব কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কারণ মা-বাবার সম্পর্ক ভালো থাকলে ঘরের পরিবেশে শান্তি ও স্থিতি বিরাজ করে। ফলে তারা উভয়েই পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সন্তান প্রতিপালনে সময় দিতে পারেন।

পক্ষান্তরে, মা-বাবার পারস্পরিক বোঝাপড়া যদি ভালো না হয়, তবে ঘরের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সন্তানের সামনেই বাবা-মা ঝগড়া-বিবাদ ও বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এটি সন্তানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা নিজেদের সমস্যা ও দ্বন্দ্ব মেটাতেই পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সন্তানের সঠিক প্রতিপালনের

দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় বা সুযোগ কোনোটাই তখন পান না।

ফলে সন্তানরা ঘরকে অশান্তির জায়গা মনে করে। তারা সুশিক্ষা ও সঠিক তরবিয়তের অভাবে মানসিক শান্তির খোঁজে বাইরে বিভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে। অনেক সময় অসৎ সঙ্গের পাল্লায় পড়ে বিপথগামী হয়ে যায়।

৪৭. তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভয় করা

ইসলামি শরিয়তে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তালাক একটি বৈধ পন্থা। তবে আল্লাহ তাআলার কাছে এটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أبغض الحلال عند الله الطلاق

অর্থ : আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট বা অপ্রিয় হালাল বস্তু হলো তালাক।[25]

কিন্তু কখনো কখনো হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হয় না। শেষ পর্যন্ত তাদের বিচ্ছেদ বা তালাক হয়েই যায়। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে উভয়ের উচিত সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হলেও সন্তানের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হয় না।

25 সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২১৮৭

এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত, পারস্পরিক জেদ ও ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে সন্তানকে কষ্ট না দেওয়া। বরং যাতে সন্তানের মঙ্গল হয়—এমন পন্থাই অবলম্বন করা। নিজেদের পারস্পরিক বিদ্বেষের জাঁতাকলে সন্তানকে পিষ্ট না করা। এটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিচ্ছেদের পর পিতা-মাতার প্রত্যেকেরই কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। সন্তানের হৃদয়ে অপরজনের প্রতি ঘৃণা বা বিষবাষ্প না ছড়ানো। বরং শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বজায় রাখা। সন্তানের সামনে একে অপরের গীবত বা নিন্দা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। কারণ মা-বাবা যখন একে অপরের সমালোচনা করেন, তখন সন্তানের কোমল মনে এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। তাদের জীবন থেকে মানসিক শান্তি বিদায় নেয়। আর এটি সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ ও ভবিষ্যতের পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধক।

৪৮. আদর্শ মাদরাসা ও স্কুল নির্বাচন করা

ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা, যেখানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সার্বিক পরিবেশ আদর্শবান। মা-বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, ক্লাস পদ্ধতি ও নীতিমালা যেন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়। সেখানে যেন পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের চরিত্র গঠন, আদব-কায়দা ও নৈতিক আচার-আচরণের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, এত কিছু কেন দেখতে হবে?

কারণ হলো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং সেখানকার শিক্ষার প্রভাব শিশুদের মনের ওপর খুব দ্রুত পড়ে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়।

তারা নিজের অজান্তেই তাদের শিক্ষক ও সহপাঠীদের স্বভাব-চরিত্র গ্রহণ করে নেয়। তাই কেবল ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকা যাবে না। নিয়মিত তার খোঁজখবর রাখতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাচ্চাদের পড়াশোনা ও চারিত্রিক অবস্থার রিপোর্ট নিতে হবে। যেন কোনো বিষয়ে ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখা দিলে সহজেই তা সংশোধন করা যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা শিক্ষা ও চারিত্রিকভাবে একেবারে বিগড়ে যাওয়ার পর পিতা-মাতার হুঁশ ফেরে। কিন্তু তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই আগে থেকেই সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

৪৯. ঘরোয়া তালীম এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

দ্বীনী পরিবেশ তৈরির জন্য ঘরে মাঝে মাঝে 'তালীম'-এর আয়োজন করা উচিত। এই তালীমের আসরে ভালো ও শিক্ষণীয় বই-পুস্তক পাঠ করা হবে। পরিবারের সদস্যদের—বিশেষত শিশুদের বয়স ও আগ্রহ অনুযায়ী—উপকারী নির্দেশনা ও উপদেশ দেওয়া হবে। এ ধরনের নিয়মিত তালীমের মাধ্যমে শিশুরা অনেক অজানা ও উপকারী বিষয় জানতে পারে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সুন্দরভাবে কথা বলা (কথন), শুদ্ধভাবে পড়া (পঠন) ও মনোযোগ দিয়ে শোনার (শ্রবণ) দক্ষতা তৈরি হয়।

একইভাবে ঘরোয়া পরিবেশে মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে দ্বীনী ও শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন—সূরা বা হাদিস মুখস্থ বলা, ইসলামী কুইজ ইত্যাদি।

যারা প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফল করবে, তাদেরকে উৎসাহ হিসেবে পুরস্কারও দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে শিশুদের মেধার বিকাশ

ঘটবে, জ্ঞানের পরিধি বাড়বে এবং নতুন কিছু শেখার প্রতি তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

৫০. বাচ্চাদের জন্য ব্যক্তিগত পাঠাগার বা লাইব্রেরি তৈরি করা

শিশুদের বয়স, রুচি ও ধারণক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখে বিভিন্ন ধরনের উপকারী বই-পুস্তকের সমন্বয়ে তাদের জন্য একটি ছোট ব্যক্তিগত পাঠাগার বা লাইব্রেরি গড়ে তোলা উচিত। এ ধরনের পাঠাগারে শিক্ষামূলক ও নৈতিক গল্প, নবী-রাসূলদের জীবনী, ইতিহাস এবং ইসলামি সাহিত্যের বই থাকবে। পাশাপাশি পবিত্র কুরআন কারীমের তিলাওয়াত, দোয়া ও উপকারী বয়ান-বক্তৃতা সমৃদ্ধ মেমোরি, ইউটিউব প্লেলিস্ট বা ডিজিটাল কনটেন্টও সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, হাতের কাছে বই ও শিক্ষামূলক উপকরণ থাকলে শিশুদের পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এ ধরনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি শিশুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেধা বিকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

৫১. সন্তানকে ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বাবার উচিত, মসজিদ ও তার আশপাশে যেসব ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম (যেমন—ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল বা দ্বীনী সেমিনার) অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ছেলেদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া। এতে তারা দ্বীনী মজলিসের আদব ও পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবে।

তদ্রূপ মায়ের উচিত, যেখানে পর্দা রক্ষা করে ঘরোয়াভাবে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা আছে, সেখানে নিজের মেয়েদের অংশগ্রহণ করানো।

এছাড়া আল্লাহ তাআলা সামর্থ্য ও স্বচ্ছলতা দান করলে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে হজ বা উমরা পালনের জন্য বাইতুল্লাহর সফরে যাওয়া উচিত। একইভাবে বিভিন্ন সময় ও সুযোগে সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ও পর্যটনকেন্দ্রেও সন্তানদের নিয়ে যাওয়া উচিত। এতে তাদের বিভিন্ন দিক থেকে অনেক উপকার হয়। যেমন—

১. সফরে সন্তানদের চরিত্রের ভালো-মন্দ দিক, তাদের ধৈর্য ও মন-মানসিকতা যাচাই করা যায়। ফলে তাদের উন্নত প্রতিপালনের জন্য সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া সহজ হয়।
২. তাদের মনে আনন্দ, বিনোদন ও প্রশান্তি অনুভূত হয়, যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি।
৩. নতুন নতুন অনেক জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। যার মাধ্যমে তাদের মেধা বিকশিত হয় এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৫২. সন্তানকে সৎ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত রাখা

ছেলে-মেয়েদেরকে সমাজের সৎ, দ্বীনদার ও ভালো মানুষদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সুসম্পর্ক গড়ে দেওয়া মা-বাবার দায়িত্ব। এর ফলে তাদের মধ্যে সৎ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুসরণ করার আগ্রহ তৈরি হবে। সাথে সাথে ভালো কাজের প্রতি ভালোবাসা এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

একইভাবে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে সন্তান যখন যে শাস্ত্র বা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাকে সে বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করানো উচিত। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ওই বিষয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার স্পৃহা জাগবে। এছাড়াও তারা সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করবে।

৫৩. মেয়েদেরকে ধর্মীয় ও পার্থিব জরুরি বিষয়াদি শেখানো

শিক্ষা-দীক্ষা যেমন ছেলেদের মৌলিক অধিকার, তেমনি মেয়েদেরও অধিকার। তাই সকল বাবা-মায়ের জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য। শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে, তাদের মানসিকতা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষাদান করা পিতা-মাতার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।

এর পাশাপাশি মেয়েদেরকে তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন, মাসিক, গর্ভধারণ ও প্রসূতি অবস্থার মাসআলা-মাসায়েলসহ নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিধিবিধানগুলো ভালোভাবে শেখানো মা-বাবার জন্য আবশ্যক। কারণ এসব বিষয়ের সাথে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যেমন—নামাজ, রোজার পবিত্রতা ও শুদ্ধতা জড়িত।

একইভাবে বিবাহের পরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাম্পত্য মাসায়েল তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এগুলো আগে থেকেই জানা থাকা দরকার। এছাড়া গৃহস্থালি বিভিন্ন কাজ—যেমন: রান্নাবান্না, কাপড়-চোপড় ধোয়া, ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি শেখানোও জরুরি। এতে ভবিষ্যতে তারা সুনিপুণ গৃহিণী হিসেবে সংসার পরিচালনা করতে পারবে।

৫৪. মেয়েদেরকে একা একা বাইরে বের হতে না দেওয়া

বাজারের কোনো কাজ, ডাক্তারের সাথে দেখা করা, কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া বা কোনো বান্ধবীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা—যেকোনো প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাহরাম পুরুষ (যাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েজ এবং বিবাহ হারাম) ব্যতীত মেয়েদের একা বের হতে না দেওয়া উচিত।

আর বাইরে বের হওয়া যদি অতীব জরুরি না হয়, কিংবা এমন কোনো প্রয়োজন যা ছেলেদের দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে পূরণ করা সম্ভব, তাহলে মেয়েদের অহেতুক বাইরে যেতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

অর্থ: 'আর তোমরা (নারীরা) নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলী যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।।[26]

সুতরাং মেয়েদের এমন কোনো স্কুল-কলেজে পাঠানো উচিত নয় যা বাড়ি থেকে অনেক দূরে। যেখানে আনা-নেওয়ার জন্য কোনো মাহরাম পুরুষ বা শরিয়তসম্মত নিরাপদ ব্যবস্থা নেই। নিরাপত্তার স্বার্থে এ বিষয়ে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা জরুরি।

৫৫. ভিন্ন লিঙ্গের ও বিজাতীয় সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বিরত রাখা

ছেলেদেরকে মেয়েদের মতো পোশাক পরানো, সাজসজ্জা করানো বা মেয়েলী স্বভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা মা-বাবার জন্য অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো পোশাক

26 সূরা আহযাব : ৩৩

পরানো, ছেলেদের মতো চলাফেরা করা ও তাদের অনুকরণ করা থেকেও কঠোরভাবে বারণ করতে হবে।

এ বিষয়ে হাদিসে পাকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই সমস্ত পুরুষদের অভিশম্পাত করেছেন যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং ওই সমস্ত নারীদের অভিসম্পাত করেছেন যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।[27]

একইভাবে বাচ্চাদেরকে কাফের, মুশরিক, হিন্দু, শিখ কিংবা হলিউড-বলিউডের কোনো মডেল বা নায়কের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকেও বিরত রাখতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধর্মীদের অনুকরণকারীদের ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

من تشبه بقوم فهو منهم

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[28]

৫৬. বৈরী মেলামেশা থেকে দূরে রাখা

নাবালক পুত্রসন্তানের মধ্যে যখন সামান্য বোধশক্তি ও লজ্জাবোধ তৈরি হয়, তখন থেকেই তাকে গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে দেখা দেওয়া হারাম) নারীদের কাছে অবাধে যাওয়া-আসা করা থেকে বিরত রাখা বাঞ্ছনীয়। তারা যখন বয়ঃসন্ধিকালের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তখন এ ব্যাপারে তাদেরকে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে এবং পুরুষদের মজলিসে বা পুরুষদের সাথে বেশি সময় কাটানোর ব্যাপারে জোর দিতে হবে।

---

27 সুনানে কুবরা, নাসাঈ ৯২০৯

28 সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪০৩১

তদ্রূপ মেয়েরাও যখন একটু বড় হবে, তখন মাহরাম ব্যতীত অন্য কোনো ছেলে বা পুরুষদের কাছে যেতে বা মিশতে তাদের বারণ করতে হবে। তাদের মেয়েদের সাথেই অবস্থান করতে এবং মেয়েলি পরিবেশে সময় কাটাতে বলতে হবে। এমন কোনো স্কুল-কলেজ বা কোচিং সেন্টারে তাদের ভর্তি করা উচিত নয় যেখানে অবাধ 'সহশিক্ষা' চালু রয়েছে এবং পর্দার পরিবেশ নেই।

৫৭. উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করিয়ে দেওয়া

ছেলে যখন বিবাহের উপযুক্ত হবে, বিবাহের যাবতীয় খরচ ও স্ত্রীর দায়-দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জন করবে এবং সে নিজে থেকে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, তখন বাবা-মায়ের উচিত দেরি না করে ছেলেদের জন্য উপযুক্ত ও দ্বীনদার পাত্রী দেখে বিবাহ করিয়ে দেওয়া। যাতে করে তারা গুনাহমুক্ত থেকে নিজেদের জীবন পবিত্রভাবে কাটাতে পারে।

একইভাবে মেয়েরাও বিবাহের উপযুক্ত হলে এবং তাদের ধার্মিকতা, নৈতিকতা ও আখলাক-চরিত্রের উপযোগী ভালো কোনো পাত্র বা সম্বন্ধ মিলে গেলে, অহেতুক কালবিলম্ব না করে তাদের বিবাহ করিয়ে দেওয়া উচিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا

অর্থ: 'হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না। যথা:

১. যখন নামাজের সময় হয়ে যায়।

২. যখন জানাজা উপস্থিত হয়ে যায় এবং

৩. মেয়েদের জন্য যখন উপযুক্ত বা সমকক্ষ পাত্র পাওয়া যায়।' [29]

৫৮. সন্তান প্রতিপালনের সুফল লাভের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা

অনেক সময় বাবা-মা সন্তানের লালন-পালনে মনোযোগী হন এবং তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কখনো কখনো এই প্রচেষ্টার সুফল খুব দ্রুতই দৃশ্যমান হয়। আবার কখনো কখনো এ ধরনের প্রচেষ্টার সুফল আসতে বেশ সময় লাগে।

তাই বাবা-মায়ের উচিত, তাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। পরম ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করে সুফল লাভের প্রতীক্ষায় থাকা। সুফল লাভের ব্যাপারে অধৈর্য হওয়া বা তাড়াহুড়া করা অনুচিত। মনে রাখতে হবে, ভালো জিনিসের ফল ফলতে একটু সময় লাগতেই পারে।

৫৯. নিরাশ না হওয়া

অনেক সময় দেখা যায়, পিতা-মাতা তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে সন্তানদের উত্তম লালন-পালনের চেষ্টা ও মেহনত করে যান। কিন্তু এরপরও সন্তানরা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে যায় বা কাঙ্ক্ষিত পথে চলে না। এমন পরিস্থিতিতে তাদের কোনোমতেই সাহস হারানো বা হতাশ হওয়া উচিত হবে না। কারণ সৎসাহস হারিয়ে ফেলা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া মুমিনের গুণ নয়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

29 সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ১৭১

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।[30]

অন্য জায়গায় তিনি ইরশাদ করেন—

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ হতাশ হয় না।[31]

বরং সন্তানদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্রমাগত দোয়া করতে থাকতে হবে। অন্তরে এই দৃঢ় আশা রাখতে হবে যে, এর ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। পাশাপাশি এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে এই পরিশ্রম ও চোখের পানি বৃথা যাবে না। এর ফল অবশ্যই মিলবে—তা আজ হোক বা কাল।

৬০. ভালো কাজে শিশুদের সহযোগিতা করা

শিশুরা যখন কোনো ভালো কাজে অগ্রসর হয় বা কোনো নেক আমল করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন বাবা-মা তাদের শুধু মৌখিক উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন না। বরং তাদেরকে কাজে-কর্মে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করবেন। এক্ষেত্রে তাদের পথে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা সৃষ্টি করা যাবে না। মা-বাবার এই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব তাদের মনে ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ ও স্পৃহা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৬১. শিশুদের ভালো কাজের কথা স্মরণ রাখা

30 সূরা যুমার : ৫৩
31 সূরা ইউসুফ : ৮৭

বাবা-মায়ের উচিত, তাদের সন্তানদের করা ছোট-বড় ভালো কাজগুলো মনে রাখা। মাঝে মাঝে সেগুলো ইতিবাচকভাবে তাদের সামনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেমন বলা যেতে পারে—'মাশাআল্লাহ! সেদিন তুমি যে সত্য কথাটি বলেছিলে, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

এটা করা হলে তাদের মধ্যে ইতিবাচক আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। তাদের ভেতরে ভালো কাজ করা এবং এর সাথে লেগে থাকার প্রবল আগ্রহ জন্মাবে। তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের ভালো কাজগুলো মা-বাবা মূল্যায়ন করেন।

৬২. বিজ্ঞজনের সাথে পরামর্শ করা

সন্তান লালন-পালন একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর না করে প্রয়োজনে বিজ্ঞজনদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যেমন—সন্তানের ধর্মীয় বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের সাথে পরামর্শ করা। শারীরিক সুস্থতা ও পুষ্টির জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে কথা বলা। তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও চারিত্রিক বিষয়ে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ মুরুব্বিদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা।

এতে করে তাদের দৈহিক, মানসিক, চিন্তাগত এবং চারিত্রিক পরিবর্তনের অবস্থা বুঝে সে অনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং তাদের যথাযথ প্রতিপালন করা সহজ হবে।

৬৩. সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক উপকারী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা

সন্তানের সঠিক প্রতিপালনের জন্য এ বিষয়ক উপকারী বই-পুস্তক পড়া বা জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরি। কারণ এই বইগুলো অভিজ্ঞ লেখক, শিক্ষাবিদ এবং বুজুর্গদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সারনির্যাস। তাই

সন্তানের সঠিক দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে এসব বইপত্র অধ্যয়ন করা অনেক বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আরবি ও ইংরেজি ভাষায় 'প্যারেন্টিং' বা সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে প্রচুর বই-পুস্তক ও বয়ান-বক্তৃতা পাওয়া যায়। তবে উর্দু (তেমনি বাংলা) ভাষায় এ জাতীয় আলোচনা ও সাহিত্য এখনো কিছুটা অপ্রতুল। ফলে এ বিষয়টি শিক্ষিত মহলের ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণার দাবি রাখে। ব্যক্তিগতভাবে, উর্দু ভাষায় ইবনে ফরীদ রহ.-এর রচিত 'বাচ্চুঁ কি তরবিয়ত' (সন্তান প্রতিপালন) বইটি আমার কাছে এ বিষয়ে বেশ সুন্দর, গোছানো ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। সকল পিতা-মাতার উচিত এই কিতাবটি সংগ্রহ করে পড়া।

৬৪. সন্তানের উত্তম প্রতিপালনের প্রতিদান ও সওয়াবের কথা স্মরণ রাখা

ইসলামী শরিয়তে সন্তানের আদর্শিক প্রতিপালনের মহান দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিনিময়ে দুনিয়া ও পরকালে তাদের জন্য বিশাল প্রতিদান ও সওয়াবের ঘোষণা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। এটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। এই পুরস্কারের কথা মনে রাখলে সন্তানের আদর্শ প্রতিপালন ও উত্তম যত্নের ব্যাপারে পিতা-মাতার আগ্রহ তৈরি হবে। তারা এ বিষয়ে আরও যত্নবান হবেন। এ পথচলায় পিতা-মাতা যেসব বাধা-বিপত্তি, রাত জাগার কষ্ট ও ত্যাগের সম্মুখীন হন, সেগুলো সয়ে নেওয়া তাদের জন্য সহজ হবে। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তারা এতে আনন্দ খুঁজে পাবেন।

সন্তানের আদর্শিক প্রতিপালনের দুনিয়াবি উপকারিতা তো সকলের কাছেই স্পষ্ট। কেননা সন্তান নেককার হলে তা পিতা-মাতার জন্য

চোখের শীতলতা এবং সমাজে সুনাম ও সুখ্যাতির কারণ হয়। আর পরকালের অশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত ও সওয়াবের কথা হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

অর্থ: 'যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। যথা:

১. সদকায়ে জারিয়া।

২. এমন ইলম যার দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে এবং

৩. এমন নেক সন্তান যে দুনিয়ায় তার জন্য দোয়া করে।[32]

অর্থাৎ পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরও তাদের নেক সন্তান তাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং ভালো কাজ করতে থাকবে। ফলে এর সওয়াব ও প্রতিদান কবরে শুয়ে থাকা পিতা-মাতার আমলনামায় পৌঁছতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ!

৬৫. লালন-পালনে ভুল-ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি স্মরণ রাখা

সন্তান সর্বদা সন্তানই থাকে। মা-বাবার সাথে সন্তানের এই নাড়ির সম্পর্ক কোনোভাবেই ছিন্ন হওয়ার নয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা যদি যথাযথ লক্ষ্য না রাখেন বা অবহেলা করেন,

32 আবু দাউদ, হাদীস : ২৮৮০

তবে ভবিষ্যতে এই সন্তানই তাদের জন্য চরম লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হতে পারে।

সন্তান যদি অন্যদের চোখে খারাপ হয় বা অসামাজিক হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আঙুল তোলে পিতা-মাতার দিকে। মানুষের কটুকথা, গালমন্দ ও বদনাম তাদের ওপরই এসে পড়ে। তাছাড়া সন্তান প্রতিপালনে উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা পরকালেও আল্লাহর কাছে পাকড়াও হওয়ার একটি বড় কারণ হবে।

অতএব, কোনো মানুষ যদি ইহকাল ও পরকালের এই ভয়াবহ ক্ষতি ও জবাবদিহিতার কথা সামনে রাখে, তবে এটি তাকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক, আগ্রহী ও দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করবে।[33]

শেষ কথা

মোটকথা, কুরআন ও হাদিসে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক যেসব নির্দেশনা ও বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ হিসেবে এখানে ৬৫টি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন মা-বাবার দায়িত্ব হলো, এসব নীতিমালার আলোকে সন্তানের সঠিক লালন-পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা—কোন বিষয়টি সন্তানের দ্বীনী, দুনিয়াবি, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে উপকারী।

---

33 আলহামদুলিল্লাহ আজ ২৭ সফর ১৪৪৭ হিজরী / ২১ আগস্ট, ২০২৫ ঈসায়ী / ৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার অনুবাদ সমাপ্ত হল। - অনুবাদকবৃন্দ

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সেসব উপকারী বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আর যেসব বিষয় তার জন্য ক্ষতিকর, সেগুলো থেকে তাদেরকে যেকোনো মূল্যে সুরক্ষিত রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নেক সন্তান গড়ার তাওফিক দান করুন। আমীন। [34]

34 আলহামদুলিল্লাহ আজ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী / ২৬শে জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪৭ হিজরি / ২রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ রোজ বুধবার রাত ৯টা ৫৩ মিনিটে সম্পাদনা সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তাআলা কাজটিকে আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করে নিন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম উম্মাহর প্যারেন্টিং লাইফে ব্যাপক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বইটিকে কবুল করুন। - মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান